আমাদের ভাষা-আন্দোলন

কিশোর ইতিহাস

রফিকুর রশীদ

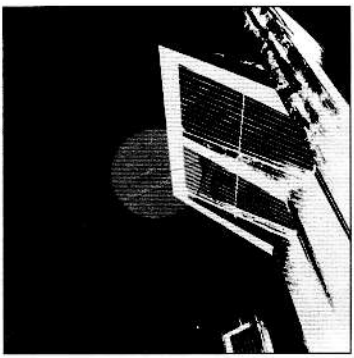

আমাদের ভাষা-আন্দোলন

আমাদের ভাষা-আন্দোলন

কিশোর ইতিহাস

রফিকুর রশীদ

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

প্রকাশনার এক দশক

আমাদের ভাষা-আন্দোলন : কিশোর ইতিহাস
কিশোরসাহিত্য
রফিকুর রশীদ

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail : ittadisutrapat@yahoo.com
web : www.ittadigranthoprokash.com

পরিবেশক
যুক্তরাষ্ট্র : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক
যুক্তরাজ্য : সঙ্গীতা, ২২ ব্রিক লেন, পূর্ব লন্ডন
রূপসী বাংলা লিমিটেড, ২২০ টুটিং হাই স্ট্রিট, লন্ডন

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অক্ষরায়ন
বন্ধু কম্পিউটার্স
২৮/সি-২ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

ছাপাখানা
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি কে দাশ রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

মূল্য
১৮০ টাকা

Amader Bhasha Andolon Kishor Itihash by Rafiqur Rashid, Published by Ittadi Grantho Prokash : February 2014. Price Tk. 180, ISBN: 978 984 904 340 9

উৎসর্গ

প্রফেসর আবদুল মান্নান
সাবেক সংসদ সদস্য
শ্রদ্ধাভাজনেষু

ইত্যাদি প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

প্রবন্ধ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : কিশোর ইতিহাস

উপন্যাস

ভালোবাসার জলছবি

কিশোরকাব্য

আকাশজোড়া মায়ের আঁচল

শিশুগল্প

শান্তামনির আঁকাআঁকি

মুজিবনগরের গল্প

কিশোরগল্প

মুক্তিযুদ্ধের কিশোরগল্প

ভূমিকা

বাঙালি জাতির সংগ্রামমুখর ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন এক গৌরবময় অধ্যায়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি (২২ ফেব্রুয়ারিও বটে) ঘটে যাওয়া এ আন্দোলনের শোকাবহ পরিণতির কথা আমরা বছরের এই বিশেষ দিনে স্মরণ করি, শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন অথবা বিশেষ মুনাজাত করি; এমনই সব আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব কর্মকাণ্ডের ফ্রেমে বন্দি করে অমর একুশকে আমরা জাতীয়ভাবে স্মরণীয় একটি দিবসে পরিণত করেছি। কিন্তু বিশেষ ওই দিবসটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবনে এবং তা বাস্তবায়নে যথেষ্ট যত্নবান হতে পেরেছি বলে মনে হয় না। এমন কি ভাষা আন্দোলনের সেই গৌরবময় ইতিহাসও সহজ-সরল প্রাঞ্জল ভাষায় লিখে আমাদের তরুণ প্রজন্মের সামনে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। পূর্বপুরুষের বীরত্বপূর্ণ কীর্তিগাথার সঙ্গে উত্তরপুরুষের পরিচয় যদি নিবিড় এবং আন্তরিকতাপূর্ণ না হয়, তাহলে বহু পূর্বে ঘটে যাওয়া গৌরবদীপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে নিজেকে যোগযুক্ত করবে কি করে উত্তরপুরুষ? সেই গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিতই বা ভাববে কেমন করে? আর পূর্বপুরুষের কাছে উত্তরপুরুষের যে ঋণ, সেই ঋণ যদি কেউ উপলব্ধি না করে, তা হলে তো ঋণশোধের কোনো দায়-ই বোধ করবে না তারা।

কাজেই সবকিছুর আগে দরকার ভাষা আন্দোলনের উপরে লেখা নির্ভরযোগ্য একটি ইতিহাস বই। বাজারে এ বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ একাধিক বই আছে। আবার ছোটদের জন্য লেখা আয়তনে বা কলেবরে ছোট ভাষা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বা এই ধরনের নামসম্বলিত বই বাজারে মোটেই দুর্লভ নয়। কোনো বইয়ে তথ্যের অপর্যাপ্ততা নজরে পড়ে। আবার কোনো কোনো বই পড়ে বুঝা কঠিন হয়ে পড়ে যে এটি ছোটদের জন্যে লেখা বই হলো কেমন করে! রসকষহীন নিষ্প্রাণ ইতিহাস ছোটদের ভালো লাগবে কেন? আর এমন খট্‌মটে ইতিহাসের সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী!

আমি এই সম্পর্কটাকেই বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছি 'আমাদের ভাষা-আন্দোলন : কিশোর ইতিহাস' গ্রন্থে। এ দেশের শিশু-কিশোর-তরুণদের বড়

হয়ে উঠতে উঠতে জেনে নেয়া দরকার—দেশের সঙ্গে, দেশের মানুষের সঙ্গে, দেশের ইতিহাসের সঙ্গে এবং মাতৃভাষার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কবে কীভাবে রচিত হয়েছে। সম্পর্কের সুতোটা চিনতে পারলেই তারা বিশেষ নৈকট্য অনুভব করতে শিখবে। অদৃশ্য সেই সুতোয় টান পড়লেই তাদের অন্তরে ভালোবাসা জেগে উঠবে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি, মাতৃভূমির ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসের নির্মাতা মানুষের প্রতি। আর ভালোবাসলে তবেই আসে দায়িত্ব কর্তব্যের কথা, আসে পূর্বপুরুষের ঋণ শোধের কথা। আমার বিবেচনায় বাঙালির ভাষা আন্দোলনের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য শুধুমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা লাভের মধ্যেই সীমিত নয়, আরো বহুদূর বিস্তৃত। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এ দেশের মানুষ শেকড়ের সন্ধান করতে শিখেছে। আত্মপরিচয়ের স্বরূপ অন্বেষণ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া; বাঙালির ভাষা আন্দোলনের এটাও ছিল সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য। আর সে কারণেই বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের পথরেখা ধরেই বাঙালি পৌঁছে গেছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এবং নয় মাসব্যাপী বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধশেষে প্রতিষ্ঠা করেছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হয়েছে বাংলা ভাষা। আমাদের ভাষা আন্দোলন চর্যাপদের কাহ্নপা লুইপা থেকে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পর্যন্ত প্রবাহিত সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচন করেছে কীর্তিমন্ত পূর্বপুরুষদের লড়াই-সংগ্রামের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল করেছে।

দৃশ্যাতীত হলেও প্রবহমান সম্পর্কের এই ধারার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে নিয়ে আমাদের তরুণ সমাজ যদি মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং দায়িত্বশীল হয়ে ওঠার কোনো প্রেরণা এ বই থেকে পায়, তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

৩০.০৮.২০১৩
গাংনী, মেহেরপুর

রফিকুর রশীদ

বাংলা নামের দেশ

আমরা বাঙালি।

আমাদের এই দেশের নাম বাংলাদেশ। আমাদের মুখের ভাষার নাম বাংলা ভাষা। আমরা যে দেশে জন্মেছি, সেই দেশকে বলি জন্মভূমি। আবার সেই দেশকে মাতৃভূমিও বলি। জন্মের উপরে কারো হাত থাকে না। কে কোথায় জন্মগ্রহণ করে, সে-কথা কি সে নিজে বলতে পারে? জন্মের পর ধীরে ধীরে মানুষ জানতে পারে, বুঝতে পারে—কোথায় তার জন্ম। জন্মের পর ধীরে ধীরে চিনতে শেখে—কোন মাটিতে পা ফেলে তার মাথা উঁচু করে হাঁটতে শেখা। ধীরে ধীরে বুঝতে পারে—কোন দেশের ধুলোমাটিতে খেলতে খেলতে তার বেড়ে ওঠা। মানুষ হয়ে ওঠা। হ্যাঁ, সেই দেশের একটা নাম আছে বটে, একাধিক নামও থাকতে পারে; তা নাম তার যা-ই হোক, বড় হয়ে ওঠার পর মানুষ টের পায়—দেশটাও যেনবা মায়েরই মতন। মা যেমন আদর সোহাগ দিয়ে, সেবা যত্ন দিয়ে, আশ্রয়-ভালোবাসা দিয়ে সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখে, বড় করে তোলে, সবার জন্যে বুক পেতে দেয়, দেশও কিন্তু তা-ই করে। আশ্রয় দেয়, আগলে রাখে, অন্ন যোগায়; মানুষ করে তোলে। সেই জন্যে বলা হয় মাতৃভূমি। মায়ের যে ভূমি, অথবা মায়ের মতন ভূমি কিংবা মায়ের সমান যে ভূমি, তাকেই বলে মাতৃভূমি। এই দেশের কবি সাহিত্যিকেরা মাতৃভূমি বা দেশমাতাকেও মা বলেই ডাকতে শিখেছেন, মায়ের সমান ভক্তি করতে শিখিয়েছেন। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতটি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে অপরূপ এক মায়ের ছবি, সেই মা স্নেহের আঁচল বিছিয়ে রেখেছে বটের মূলে, নদীর কূলে-সর্বত্র।

ছোট্ট বন্ধুরা, জন্মের উপরে মানুষের হাত থাক বা না থাক, জন্মের পর চোখ মেলতেই মানবশিশু যাকে সবচেয়ে কাছে পায়, সবচেয়ে আপন করে পায়, সেই মানুষটি সবার চেয়ে আলাদা, সেটা বুঝতে পারে সহজাত বুদ্ধি থেকেই আপনা-আপনি। তাকেই সে ডেকে ওঠে মা বলে। সেই মা না-ও হতে পারে ধনীর দুলালি, তার আঁচলে না থাক ধন-রত্নের বিপুল সঞ্চয়; তবু

সে মা। সন্তানের চোখে দুনিয়ার সেরা মানুষ। মাতৃভূমিও সেই রকম। তার কোলে জন্ম নিতে পেরেই জীবন ধন্য হয়েছে বলে মনে করে সন্তান। তাই তো এ দেশের কবি গভীর মমতায় উচ্চারণ করেন—'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। সার্থক জন্ম মাগো তোমায় ভালোবেসে।'

মাকে আর কে না ভালোবাসে বলো! মায়ের কাছে কি সন্তানের ঋণের শেষ হয়? মা আদর করে, মুখে খাবার দেয়, বিপদে আপদে বুক দিয়ে আগলে রাখে সন্তানকে, সেবা-যত্নে মানুষ করে তোলে; সন্তান কি পারে মাকে ভুলে থাকতে? ছোট্ট সোনামণি, তোমরা সবাই নিশ্চয় মাকে খুবই ভালোবাস। সেটাই স্বাভাবিক। মা-বাবা, ভাই-বোন, মামা-কাকা সবাই তোমাদের আপনজন। তাঁরা তোমাদের ভালোবাসেন। তোমরাও তাঁদের শ্রদ্ধা জানাও, ভালোবাস। তাঁদের সুখে সুখী হও, তাঁদের আনন্দে খুশি হও। আবার তাদের দুঃখে তোমরাও দুঃখ পাও। তাঁদের বেদনায় সমব্যথী হও, সান্ত্বনা দাও। আপনজনের দুঃখে-কষ্টে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর নাম ভালোবাসা। এই যে আপনজনের জন্য গভীর স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা, সেটা কিন্তু আপন দেশের জন্যেও অনুভব করার কথা। মায়ের জন্যে যে ভালোবাসা, মায়ের মতো মাতৃভূমির জন্যেও সেই ভালোবাসা, এমন কি মাতৃভাষার জন্যেও। হ্যাঁ বন্ধুরা, একটুখানি চোখের আড়াল হলে মায়ের জন্যে তোমরা যেমন বুকের মধ্যে টান অনুভব কর, তোমাদের এই দেশের জন্যে কি কখনো সেই রকম টান টের পেয়েছ? এই যে সোনার দেশ আমাদের, তোমার আমার সবারই তো এই একটাই ঠিকানা আমাদের, ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল ভূ-খণ্ডের উত্তরে আছে উন্নত শির-অটল হিমালয়, দক্ষিণে প্রবহমান বঙ্গোপসাগর। পূর্বে পশ্চিমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সীমানা সুনির্দিষ্ট। লাল-সবুজের পতাকা দিয়ে ঘেরা ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় এই বাংলাদেশ একদিন এই নামে পরিচিত ছিল না, এই আয়তনেও সীমিত ছিল না। অবশ্য স্বীকার করতেই হয়—স্বাধীন কিংবা সার্বভৌমও ছিল না।

তাহলে কেমন ছিল সেদিনের এই দেশটা? কী ছিল তার নাম?

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে আমাদের এই বাংলাদেশ। তার আগেও এই মাটি, এই নদী, পশুপাখি বনবনানী, আকাশভরা সূর্যতারা সবই ছিল, ছিল না কেবল স্বাধীনতা। আর বাংলা নামের এই দেশের নামটাও এ রকম ছিল না। অনেক অনেক বছর আগে কেউ বলতো বং, কেউ বলতো বঙ্গ, কেউবা ডেকেছে বাঙ্গালা নামে।

আমাদের বাংলা ভাষার বিখ্যাত সব কবি সাহিত্যিকেরা আদর করে বাংলা মাকেই ডেকেছে নানান নামে। সেই সব বাহারী নাম নিয়ে আবার অতি মনোহর গান বাঁধা হয়েছে :

বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের যে তার নেই কো শেষ।

পাকে পাকে পরাধীনতা

সবই ছিল, ছিল না স্বাধীনতা। আর স্বাধীনতা না থাকার মানে পরাধীনতা। 'সোনার বাংলা', 'রূপসী বাংলা', 'বঙ্গভূমি'—কবিদের বলতে বাধা নেই কিছুই। নিজের জন্মভূমিকে গালভরা আদুরে নামে ডাকতেই পারে, কিন্তু বলতে পারে না শুধু 'স্বাধীন বাংলা'। বলবে কী করে! গোটা বাঙালি জাতি যে তখন পরাধীনতার শৃঙ্খলে পাকে পাকে বন্দি! হ্যাঁ, সারা দেশের মানুষ সবাই পরাধীন। মানে পরের অধীন। নিজের অধীন নয়। জন্মসূত্রে এই দেশ আমাদের, এ দেশের সাগর-নদী আকাশ-বাতাস, ফসলের মাঠ—সব আমাদের। আমরাই এখানে বাস করব। তবু সব কিছু আমাদের অধীনে নয়।, এ কি মেনে নেয়া যায়? শত শত বছর তা-ই মানতে হয়েছে। এরই নাম পরাধীনতা। চারপাশের সবাইকে নিয়ে সবার মতামত নিয়ে আমরাই ঠিক করে নেব—কেমন করে দেশ পরিচালনা করলে নিজের দেশে সবাই মিলে সুখে শান্তিতে থাকা যায়; না, সেটা হবার উপায় নেই। কে হবে এই দেশের রাজা-বাদশা, দেশের মানুষ সেটা ঠিক করতে পারবে না, সে অধিকার তাদের নেই; সেটাও চাপিয়ে দেয়া হবে বাইরে থেকে। এমন কি আমার জমিতে আমি কোন ফসলের চাষ করলে আমার ভালো হবে সেই সিদ্ধান্ত পর্যন্ত আমাকে নিতে দেবে না। পরাধীনতা আর বলে কাকে! মাঠঘাট ফুল বাগান সবই আছে, এই দেশেই আছে, নেই শুধু নিজেদের অধীনে। এর নাম পরাধীনতা।

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা কি কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম শুনেছ? অনেকে তাঁকে ডিএল রায় বলে। কবি শুধু নন, তিনি অমর নাট্যকারও। খ্যাতিমান সেই কবি ডিএল রায়ের একটি গান নিশ্চয় তোমরা শুনেছ, যেখানে তিনি বলেছেন :

ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এ বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

হ্যাঁ সোনামণি, কবির সঙ্গে তোমরাও হয়তো একমত হবে এবং সমবেত কণ্ঠে বলে উঠবে—এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি/ সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি। রূপবতী এই রানির রূপে সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যুগে যুগে নানান দেশের নানান জাতির মানুষ এখানে এসেছে। রানির ঐশ্বর্য অর্থাৎ এ দেশের ধনসম্পদের লোভে তারা কৌশলে দেঁশের শাসন ক্ষমতা তুলে নিয়েছে নিজেদের হাতে। তারা অতি নিষ্ঠুর হাতে শোষণ করেছে এ দেশের সোনার সম্পদ, আর নির্মম হাতে নিপীড়ন, নির্যাতন, শাসন করেছে এ দেশের সহজ সরল মানুষকে। বহুকাল এমনটাই হয়ে আসছে। কিন্তু ১৭৫৭ সালে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করে ইংরেজরা এ দেশের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিলে প্রায় দুইশো বছরের পরাধীনতার শেকলে বন্দি হয়ে যায় বাঙালি জাতি। দিনের পর দিন যায়, শাসন-শোষণ-অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রাও বেড়ে যায়। কৃষক তার নিজের জমিতে নিজের ইচ্ছেমতো ফসল ফলাতেও পারবে না, ব্যবসায়ী তার ইচ্ছেমতো ব্যবসা করতেও পারবে না—এ কি মেনে নেয়া যায়? এ সবও করতে হবে ইংরেজের হুকুম অনুযায়ী। এতটাই ছিল পরাধীনতা। এমনই ছিল জুলুম। নিজের ভালো জমিতে কৃষক ধান নাকি পাটের আবাদ করবে সে স্বাধীনতাও তার নেই। ভালো জমি দেখলেই ইংরেজ আদেশ দেয় নীল চাষের। সে আদেশ অমান্য করলেই ভয়াবহ শাস্তি, নির্মম নির্যাতন, হত্যা, গুম পর্যন্ত। কার কাছে বিচার চাইবে? আইন-আদালতও ইংরেজের দখলে। কে শুনবে নালিশ? ফলে বাধ্য হয়ে ধানের জমিতে নীলের চাষ করে বাংলার কৃষক। লাভ হয় ইংরেজ নীলকরদের। আধুনিক যুগের কেমিক্যাল রং আবিষ্কার হওয়ার আগে পর্যন্ত নীল গাছের রস থেকে তৈরি হতো নীল রং। সেই রঙের খুব দাম ইউরোপ-আমেরিকায়। লোভী ইংরেজরা অধিক লাভের আশায় এ দেশের কৃষকদের উপরে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়ে তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে নীল চাষ করিয়ে নিয়েছে। নীলকরদের নির্যাতনের সাক্ষী হয়ে আজো বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে আছে নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ। নীলকর ইংরেজদের নিষ্ঠুরতার কাহিনী অবলম্বনে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ এক নাটক লিখেছেন দীনবন্ধু মিত্র। নাম তার 'নীলদর্পন'। বড় হলে তোমরা পড়ে দেখ। সারা শরীর তোমাদের শিউরে উঠবে তাদের অত্যাচারের ধরণ দেখে। কিছুদিনের মধ্যে এ নাটকের অভিনয়ও বন্ধ করে দেয় ইংরেজ শাসকেরা। এমন কি ইংরেজি ভাষায় এ 'নীলদর্পণ' অনুবাদ করার দায়ে পাদ্রী লঙ সাহেবকে কারাদণ্ড পর্যন্ত দেয়া হয়।

ভাঙব শেকল করব বিকল সব কিছু

শান্তিপ্রিয় বাঙালি জাতি চিরকাল চারপাশের সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে শান্তিতে থাকতে চায়। এ জন্যে মুখ বুজে সহ্য করে অনেক কিছু, ধৈর্য ধরে মোকাবিলা করে বৈরী পরিবেশ। তাই বলে যুগের পর যুগ তারা কেবল এভাবে শোষিত বঞ্চিত হবে, লাঞ্ছিত-অপমানিত হবে? তাই কখনো হয়! কত আর সইবে তারা? এত অত্যাচার নির্যাতনেও তারা ঘুরে দাঁড়াবে না প্রতিবাদে?

ইতিহাস বলে—না। বাঙালি যেমন অনেক কিছুই সইতে জানে, তেমনি প্রতিবাদী ভাষায় কথা কইতেও জানে, বজ্রমুষ্ঠি উর্ধ্বে তুলে নিজের দাবি প্রকাশ করতেও জানে। তারা কেন মেনে নেবে নিজের দেশের অপমান; আপন জাতির অপমান? বাঙালির রক্তে আছে বিদ্রোহের অগ্নিকণা, তারা কেন মুখ বুজে মেনে নেবে অমানবিক এই শাসন শোষণ নির্যাতন? ইংরেজ শাসনামলের দীর্ঘ দুই শ' বছরে এইসব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বাঙালি প্রতিবাদ করেছে প্রাণপণে, সেই সঙ্গে গড়ে তুলেছে নানান আন্দোলন-সংগ্রাম। ফকির মজনু শাহ এবং ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ফকির-বিদ্রোহ। শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে সূচনা হয় ব্যাপক কৃষক আন্দোলনের। এমন কি হাজী শরীয়তুল্লাহ ও দুদু মিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত ফরায়েজী আন্দোলন প্রথমে ধর্মীয় দৃষ্টিতে শুরু হলেও গরিব কৃষকের কাছে তা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবেই চিহ্নিত হয়। একশ' বছরের মাথায় ঘটে যাওয়া 'সিপাহী বিদ্রোহ' ইংরেজ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। আর বাংলার কৃষকেরা নিজেদের স্বার্থে নিজেরাই ঘটিয়ে ফেলে নীল-বিদ্রোহ। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাঙালির বুকে জ্বলে ওঠে বিদ্রোহের আগুন। ইংরেজ শাসকেরা তখন কৌশল খাটায়। বাংলা ভেঙে দুভাগ করে। এর নাম বঙ্গভঙ্গ। এই বঙ্গভঙ্গের পক্ষে-বিপক্ষে দুদল ভাগ হয়ে যায়। এভাবে দেশ ভাঙার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে একদল অগ্রসর বাঙালি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই আন্দোলনের সূত্র ধরে রাজপথে নেমে আসেন এবং 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'সহ অনেকগুলো দেশ বন্দনার গান লিখে ফেলেন এ সময়েই। অন্যদিকে বাংলা ভাঙার পক্ষে দাঁড়িয়ে যায় বাঙালি মুসলমানেরা। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনই শেষে স্বদেশী আন্দোলনে রূপ নেয়। আবার ধীরে ধীরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। এ দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াবার জন্যে তারা সশস্ত্র পথ বেছে নেয়। ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী এ পথেরই পথিক। চট্টগ্রামে ইংরেজদের অস্ত্রাগার লুঠ করার মতো দুঃসাহসিক এবং

বীরত্বপূর্ণ ঘটনাও ঘটেছে মাস্টার দা সূর্যসেন, প্রীতিলতাসহ বেশ কজন সাহসী বাঙালি সন্তানের নেতৃত্বেই।

এমনই সব আন্দোলন সংগ্রামের রক্তভেজা পথ ধরেই এগিয়ে চলে এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে গিয়ে কত মায়ের যে বুক খালি হয়েছে, তার সঠিক হিসাব নিকাশ কোথাও লেখা নেই। মাওলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথকে করেছে প্রশস্ত। এ সব আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হলেও ইংরেজ সরকার এ দেশের হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়। ফাটলের এ বীজ বপন করা হয়েছিল ১৯০৫ সালে সেই বঙ্গভঙ্গের সময়, বাংলা ভেঙে দুভাগ করার মধ্য দিয়েই। এক ভাগ পূর্ববঙ্গ, অপর ভাগে পশ্চিমবঙ্গ। যত না রাজনৈতিক, তারও অধিক সাম্প্রদায়িক ফাটলে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়া এক অস্বস্তিকর প্রেক্ষাপটে ১৯৪০ সালে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক তুলে ধরেন 'লাহোর প্রস্তাব'। ১৯০৫ সালে রোপিত ভাঙনের বীজ এই লাহোর প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে সবুজপাতাসহ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। যদিও এ প্রস্তাবে বলা হয়—ভারতবর্ষের যেসব অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা বেশি, সেসব অঞ্চলে একাধিক দেশ এবং বাকি অঞ্চল নিয়ে একটি দেশ তৈরি হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। যে দুটি (বা ততধিক) অঞ্চলে মুসলমানেরা সংখ্যায় বেশি সেখানে দুটো পৃথক দেশ না হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট শুধু ধর্মের নামে সেই দুটি অঞ্চলকে যুক্ত করে জন্ম নিল পাকিস্তান নামে অদ্ভুত এক দেশ। আর বাকি অঞ্চলগুলো নিয়ে ১৫ আগস্ট স্বাধীন হলো ভারত। এই ভারতের পূর্বপ্রান্তে রইল পাকিস্তানের এক অংশ, নাম তার পূর্ববঙ্গ, পাকিস্তানিরা পরে গায়ের জোরে 'পূর্বপাকিস্তান' নামের টোপর পরিয়ে দেয়। আর দুই হাজার কিলোমিটার দূরে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে রইল পাকিস্তানের অপর অংশ—পশ্চিম পাকিস্তান। একই দেশের দুই অংশের মধ্যে শুধু ভৌগোলিক দূরত্বই নয়, দুই অংশের নাগরিকদের জীবনযাপন, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-অভ্যাস, সাংস্কৃতিক রুচি—সব কিছুতেই যোজন যোজন দূরত্ব। ঐক্য শুধু ধর্ম বিশ্বাসে। মুসলমানের বাস উভয় অংশের পাকিস্তানে। আমাদের বাস এই নতুন দেশের পূর্বঅংশে, যা ছিল পূর্ববঙ্গ, হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ববঙ্গে ছিল হিন্দু-মুসলমানের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। পূর্বপাকিস্তান হওয়ার পর দেখা গেল—এ দেশ থেকে হিন্দু জনসাধারণ ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে ভারতে, আবার ভারত থেকে তাড়া খেয়ে এ দেশে আসছে মুসলমানেরা। সাধের পাকিস্তান তবু তো স্বাধীন

হলো! অখণ্ড এক ভারতবর্ষ ভেঙে স্বাধীন দুই দেশের অভ্যুদয়ে ব্যথিত এক বাঙালি কবি অন্নদাশঙ্কর রায় গভীর দুঃখে ছড়া লেখেন :

তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ কর
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ কর—
তার বেলা?

স্বাধীন দেশে স্বপ্নভঙ্গ : আবার শোষণ-বৈষম্য

নতুন দেশ স্বাধীন পাকিস্তান। দুই অংশ মিলে ছয় কোটি মানুষের বাস। চার কোটি পূর্ব পাকিস্তানের, দুই কোটি পশ্চিম পাকিস্তানের। নতুন দেশে শিক্ষা-চাকরি ব্যবসার সুযোগ এবং অধিকার—সব কিছুতেই ন্যায্য ভাগাভাগি হবে এটাই সবার প্রত্যাশা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। সোজা অংকেরও উত্তর মেলেনি সহজে। বাঙালির উপরে নেমে এসেছে বৈষম্যের থাবা। এক অংশে চার কোটি আর অপর অংশে দুই কোটি, হিসেব তো খুবই সহজ। দুই কোটি মানুষের জন্যে যতটি স্কুল কলেজ হাসপাতাল-রাস্তাঘাট হবে, কিংবা চাকরি বাকরি ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ হবে, সব কিছুতেই চার কোটি মানুষের জন্যে লাগবে তার দ্বিগুণ। এটাই সহজ হিসাব। শুরু থেকেই এই সহজ হিসেব মানতে চায়নি পাকিস্তানের শাসকেরা। জাতীয় রাজস্ব আয়ের শতকরা ৬২ ভাগ যোগান দেয় পূর্বপাকিস্তান। অথচ খরচের বেলা জাতীয় বাজেটের শতকরা ২৫ ভাগ পায় পূর্বপাকিস্তান, ৭৫ ভাগ পায় পশ্চিম পাকিস্তান। শিক্ষা ক্ষেত্রে একজন করাচির মানুষ মাথাপিছু বরাদ্দ পায় ৪ টাকা ৩ আনা ৩ পাই, সিন্ধু প্রদেশের মানুষ মাথাপিছু পায় ৩ আনা ৬ পাই, সীমান্ত প্রদেশের মানুষ পায় ৩ আনা ৩ পাই; আর পূর্বপাকিস্তানের মানুষ মাথাপিছু পায় ১ পাইয়ের ৩ ভাগের ১ ভাগ।[১] কি চমৎকার ভাগাভাগি! সামরিক বেসামরিক চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল আকাশ-পাতাল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যতজন পূর্বপাকিস্তানের সৈনিক ছিল তার ২৫ গুণ বেশি সৈনিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের।[২] পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিজাত পণ্য রফতানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়, তার প্রায় সবটুকুই ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। ভ্রাতৃত্ব আর বলে কাকে! দুই হাজার কিলোমিটারের ভৌগোলিক দূরত্ব নাকি পাকিস্তানি শাসকেরা ঘোঁচাতে চেয়েছিল ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব দিয়ে। এই কি সেই ভ্রাতৃত্বের নমুনা? ১৯৪৭ পেরিয়ে '৪৮ সাল আসতেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বপ্নভঙ্গ ঘটতে শুরু করে। ওদের বৈষম্য আর শোষণ এতই প্রকট যে এ দেশের মানুষ নিজের দিকে তাকিয়ে এ কথা আর মানতে পারে না যে, 'মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই।' বরং পার্থক্যটা হয়ে ওঠে স্পষ্ট।

ওদের ভাষা, চেহারা, পোষাক, খাবার, রুচি, সংস্কৃতি—জীবন যাপনের প্রায় সব অনুষঙ্গই আলাদা। তখন সত্য হয়ে ওঠে—'ভাইয়ে ভাইয়ে মিল নেই'। এ দেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্ম-বিশ্বাসে মুসলমান হলেও জাতির বিচারে বাঙালি, বাংলা তাদের মাতৃভাষা, বাঙালির আছে নিজস্ব পরিচয় ও সংস্কৃতি। ধর্মীয় বা নাগরিক পরিচয়ের বদল হতে পারে, কিন্তু জাতি-পরিচয়ের বদল হয় না। ধর্মীয় পরিচয়ের অভিন্নতার সুযোগে পাকিস্তানিরা যে বাঙালির সামনে শোষণ বৈষম্যের ফাঁদ পেতেছে এটা বুঝে উঠতেই পূর্বপাকিস্তান জুড়ে আবারও শুরু হয় শোষণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম, শুরু হয় নিজের অধিকার অর্থাৎ স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম। অর্থনৈতিক বৈষম্য স্পষ্ট হয়ে ওঠার আগেই বাঙালিরা চমকে ওঠে তাদের মাতৃভাষার উপরে আঘাত হানতে দেখে। তাই এবারের আন্দোলনের সূচনা হলো সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে, নতুন দেশের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন থেকে। হ্যাঁ, তাই। এই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানি শাসকদের অগণতান্ত্রিক ও গোঁয়ার্তুমিপূর্ণ মনোভাব তথাকথিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আলগা করে দেয়। তারপর দিনে দিনে শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্যের চিত্র যতই উন্মোচিত হয়, ততই দ্রুত ঠুনকো ভ্রাতৃত্বের জায়গা দখল করে শত্রুতা। পাকিস্তানি শাসনামলের দীর্ঘ ২৩ বছর ধরেই শোষণ-বৈষম্য থেকে মুক্তির লক্ষে বাঙালিকে প্রাণপণ লড়তে হয়েছে ওই প্রতারক শত্রুর বিরুদ্ধে। সে লড়াই অবশেষে ১৯৭১ সালে এসে মুক্তির সংগ্রামে পরিণত হয়, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সোজাসুজি বলেন, 'স্বাধীনতার সংগ্রাম'। দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যদের পৈশাচিক হামলার মুখে আত্মরক্ষা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে বাঙালি জড়িয়ে পড়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে। নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে তিরিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের মূল্যে বাঙালি অর্জন করে বিজয়, প্রতিষ্ঠা করে বাংলা নামের স্বাধীন সার্বভৌম এক দেশ—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। এই হচ্ছে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশ। 'রাষ্ট্রভাষা'র প্রশ্নে হোঁচট খেয়ে বাঙালি আত্মপরিচয় খুঁজে পেয়েছে, আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে প্রাণপণ যুক্ত হয়েছে, বুকের রক্তে প্রতিষ্ঠা করেছে বাংলা নামের দেশ। সেই অর্থে বলা যায় স্বাধীন সার্বভৌম এই দেশের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে বাংলা নামের ভাষা তথা বাঙালি জনসাধারণের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নকে ঘিরেই। ছোট্ট বন্ধুরা, কেমন মজার ঘটনা দেখেছ—আমাদের মাতৃভূমি আর মাতৃভাষার নাম কী রকম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে! পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির মানুষের কিন্তু এমন সৌভাগ্য হয় না। বাঙালির হয়েছে। জানো তো নিশ্চয়—বাঙালি আমাদের

জাতির নাম। হ্যাঁ, ওই বাংলা থেকেই হয়েছে বাঙালি। দেশ, জাতি, ভাষা- সব কিছু মিলিয়েই বাংলা। এ কথা আজ মানতেই হবে যে বাংলা নামের অনির্বাণ এক ভাষার প্রদীপই আমাদের পথ দেখিয়েছে, পৌঁছে দিয়েছে হাজার বছরের উদ্দিষ্ট ঠিকানায়।

বাংলা নামের ভাষা : লক্ষ প্রাণের আশা

বাংলা আমাদের দেশের নাম, তারও আগে বলতে হয় বাংলা আমাদের ভাষার নাম; আর সেই সুবাদেই আমরা বাঙালি। বাঙালি জাতি। ছোট্ট বন্ধুরা, বড় হলে তোমরা ভালো করে জেনে নিয়ো জাতি কতভাবে গঠিত হতে পারে, একটি মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কতগুলো বিষয়ে ঐক্য বা সাদৃশ্য থাকলে তবে জাতি হয়ে ওঠে। আমরা বাঙালি। ভাষার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে আমাদের জাতিত্বের পরিচয়। কিন্তু সেটা কবে থেকে? প্রশ্ন তো জাগতেই পারে—আমরা বাঙালি হলাম কখন থেকে? অনেক পেছনে দৃষ্টি পড়লে আজ আমাদের চমকে উঠতে হয়। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনগ্রন্থ চর্যাপদের মধ্যে অন্যতম এক পদকর্তা ভুসুকুপাদ ঘোষণা করছেন : 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী/ নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী।'[৩] ভুসুকুর এই 'বঙ্গালী' হওয়া মানে নিশ্চয় বাঙালি জাতি গড়ে ওঠা নয়। আবার ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই 'বাঙালি জাতি' নিজেকে চিনেছে এমনও নয়। বাঙালিরা তারও বেশ আগে থেকেই জাতি হয়ে আছে। ১৭৫৭ সালে কি বাঙালিরা একটা জাতি? ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিনের মতে—না, তখনো তারা জাতি তথা একটা পূর্ণাঙ্গ জাতি নয়। এই সময় থেকেই বাঙালিরা প্রকৃত অর্থে জাতি হতে শুরু করেছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের সময়ে উপমহাদেশে জাতি গঠন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রতিটি জাতি তাদের নিজস্ব সত্তা নিয়ে ঐ সময়ে দাঁড়িয়ে গেছে।[৪]

ভারতবর্ষব্যাপী এইসব জাতিসত্তার (বাঙালিসহ) অস্তিত্ব উপেক্ষা করে ধর্মীয় উন্মাদনা থেকেই ১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্টে স্বাধীন হলো পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যে বিভিন্ন জাতি ছিল, জাতিসত্তা ছিল, সেগুলোর কথা মোটেই বিবেচিত হলো না। ধর্মের ভিত্তিতে দুইটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জাতিগুলোকেও ধর্মের ভিত্তিতেই বিচার করা হলো। পাঞ্জাবি ও বাঙালি জাতি, ধর্ম ও অঞ্চলের ভিত্তিতে বিভক্ত হলো। এ ছাড়া অন্য জাতিগুলো ধর্মের কারণেই হয় ভারত, না হয় পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত থাকল। অন্তর্ভুক্তই কেবল থাকল, কিন্তু সে জাতিগুলোর কোনো স্বীকৃতি

থাকল না।[৫] স্বীকৃতিহীনতার অপমানই পূর্বপাকিস্তানের বাঙালি জনগণের বুকে সব চেয়ে বেশি করে বেজেছে। মাত্র অল্প কিছুদিন আগে এই জনতাই ধর্মীয় উন্মাদনায় মত্ত হয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হয়েছে সানন্দে, কিন্তু তার মানে কি বাঙালিত্বের বিসর্জন? পাকিস্তানি শাসকদের বাঙালি-বিরোধী নীতি ও পদক্ষেপ দেখে বাঙালির স্বপ্নভঙ্গ ঘটে অচিরেই। লড়াইটা শুরু হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন নিয়ে। পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন নাগরিকের মুখের ভাষা বাংলা, হাজার বছরের মমতাময় পরিচর্যায় সে ভাষা অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে, শক্তিশালী ও ঐশ্বর্যময় হয়েছে। পাকিস্তানের কর্তারা তবু এ ভাষাকে করেছে প্রত্যাখ্যান। মাতৃভাষার ঐ অপমান সইবে কেন বাঙালি? ধর্ম বিশ্বাসে মুসলমান হয়েও বাঙালি তার জাতি পরিচয় খুঁজে পায় বিজাতীয়দের উপেক্ষা আর অবহেলা থেকে। ঘুরে দাঁড়ায় বাঙালি। মাতৃভাষার প্রদীপ পথ দেখায় পরাধীনতার প্রগাঢ় অন্ধকারে। বাংলা নামের ভাষাই যেনবা মায়ের মতো করে হাত বাড়িয়ে দেয় পথভ্রান্ত সন্তানের জন্যে, বাঙালি জনসাধারণের জন্যে। মাতৃভাষার আয়নায় বাঙালি দেখে নেয় নিজের চেহারা, তারপর নিজের জন্যে ঠিক করে নেয় নতুন লক্ষ্য, নতুন ঠিকানা।

মাতৃভাষার নান্দীপাঠ : সম্পর্কের নানান সুতো

মায়ের মুখের ভাষাই মাতৃভাষা। মায়ের মুখ থেকে অবিরাম শুনে শুনে অনায়াসে আমরা যে ভাষা শিখি এবং বড় হতে হতে জীবনের প্রতিটি কাজে এমন কি স্বপ্ন দেখার কাজেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহার করি তার নাম মাতৃভাষা। অন্যভাবেও বলা যায়। যে ভাষা মায়ের মমতা দিয়ে বুকে তুলে নেয় সন্তানের সব চিন্তা, আনন্দ, বেদনা, স্বপ্ন-সাধ প্রকাশের ভার, সেটাই মাতৃভাষা। বাঙালির আছে বাংলা, ইংরেজের আছে ইংরেজি; ঠিক তেমনি ফরাসি, জার্মান, আরবি, ফার্সি ইত্যাদি। যত সহজে এবং প্রাকৃতিকভাবে মাতৃভাষা শেখা যায়, অন্য ভাষা কিছুতেই তত সহজে শেখা যায় না। অন্যভাষা শেখা হয় প্রয়োজনের তাগিদে, মাতৃভাষা শেখা হয় প্রয়োজন অপ্রয়োজন নির্বিশেষে, অনায়াসে। ভাষার সঙ্গে শিক্ষার সঙ্গে ওই ভাষা-ভাষী প্রতিটি ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক হয়ে ওঠে প্রয়োজনের, সবাইকে ঘিরে সে প্রয়োজনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ওই জাতির সঙ্গে। সাধারণ শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে সাহিত্য ও আরো অনেক কিছুর সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। যে কারণে একটি জাতির মাতৃভাষা হয়ে ওঠে তার জাতীয়

ভাষা। ওই ভাষা ওই জাতির প্রতিটি মানুষের জন্যে নানাবিধ সুযোগ সুবিধা তৈরি করে দেয়। মাতৃভাষা শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান বা সাহিত্যচর্চার জন্যেই নয়, জাতীয় জীবনের নানা স্বার্থ ও প্রয়োজনের সঙ্গে তার সম্পর্ক।[৬] মাতৃভাষা ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে ঐক্য ও আত্মীয়তাবোধ তৈরি করে। তৈরি হয় ভাষাগত জাতীয়তাবোধ; ভাষাকে ঘিরে রচিত হয় জাতীয়তার চেতনা। এটা হয়ে থাকে জাতীয় আবেগ থেকে। ধর্মবিশ্বাসের মতো প্রবল শক্তিও সে আবেগ মুছে ফেলতে পারে না। বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ তারই প্রমাণ বহন করে। একদা নতুন ধর্ম ইসলামের আদর্শিক প্রেরণায় শক্তিমান আরবগণ ইরান জয় করে, সেখানকার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে; কিন্তু আরবি ভাষা গ্রহণ করে না। দীর্ঘকালের শাসন সত্ত্বেও আরবি ভাষা সাহিত্য জয় করতে পারেনি ফার্সি ভাষাকে। তুরস্কেও তাই হয়েছে। শাসকেরা সেখানে আরবি চালাতে চেয়েছে। কিন্তু তুরস্কের যে লোকভাষা বা মুখের ভাষা—সেই তুর্কি ভাষাকে হঠাতে পারেনি। রাষ্ট্রভাষাও হয়েছে ওই তুর্কি ভাষাই। রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারটা মূলত ওই রকমই, সহজ করে নিলে খুবই সহজ। যে কোনো রাষ্ট্রেরই অধিক সংখ্যক মানুষ নিত্যদিনের ব্যবহারে যে ভাষাকে অনায়াসে কাজে লাগিয়ে চলেছে (তা যদি অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা হয় তবে তো কথাই নেই) সেই ভাষারই তো রাষ্ট্রভাষা হওয়ার কথা। কিন্তু অদ্ভুত রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের সময় এই সহজ এবং সাধারণ যুক্তির কথাও মানতে চায়নি অবাঙালি শাসকেরা। শুধু অবাঙালি কেন, আজ ভাবতে সত্যি অবাক লাগে—দেশ শাসনের সঙ্গে যুক্ত বাঙালি রাজনীতিবিদেরাও সেদিন ক্ষমতার লোভে সেই অবাঙালি শাসকদের সুরে সুর মিলিয়েছে, আপন মাতৃভাষার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। ছোট্ট বন্ধুরা, ব্যক্তিগত স্বার্থে অন্ধ হয়ে যারা জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়, জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তোমরাই বলো, তাদের কি শ্রদ্ধা করা যায়? জাতীয় স্বার্থবিরোধী যে কর্মকাণ্ড তারা করেছে, তা কি ক্ষমা করা যায়? বাঙালি হয়েও বাংলা ভাষার বিরোধিতা এবং অমর্যাদা করার ঘটনা পাকিস্তানি আমলের আগেও কেউ কেউ ঘটিয়েছে। মধ্যযুগের বাঙালি কবি আব্দুল হাকিম তাদের উপরে ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছেন :

যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন যুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়!

আ-মরি বাংলা ভাষা

এই দেখ ছোট্ট বন্ধুরা, আমাদের গৌরবময় ভাষা আন্দোলনের গল্প শোনাতে গিয়ে কি যে সব ভারি ভারি কথা এতক্ষণ বলে ফেলেছি! এতসব শক্ত কথা বুঝতে বোধহয় কষ্ট হচ্ছে তোমাদের। আমাদের পূর্বপুরুষেরা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে একদা যে রাজপথে গুলি খেয়ে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, দেশের আপামর জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে একেবারে ভিন্ন রকম কিন্তু শক্তিশালী আন্দোলন করেছেন এবং সেই ভাষা-আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতায় মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ—ইতিহাসের এই সব গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের গল্প না হয় ধীরে ধীরে বিস্তারিত জানা যাবে। তার আগে এসো আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষার একেবারে গোড়ার কথা সহজ কথায় জেনে নিই।

তোমরা এ কথা জানো তো সোনামণি, রক্ত ঝরানো সেই ভাষা আন্দোলনেরও অনেক আগে বাংলা ভাষার এক মরমী কবি বুক ফুলিয়ে গান গেয়েছেন :

মোদের গরব মোদের আশা
আ-মরি বাংলা ভাষা...।

হ্যাঁ, আমাদের এই বাংলা ভাষাকে জন্ম থেকেই পাথর ছড়ানো দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। ভাষার লড়াইয়ের কথা বললেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ছবি। কিন্তু এ লড়াইয়ের গোড়ার কথা জানতে হলে আমাদের আরো পিছনে ফিরে তাকাতে হবে। তাহলেই জানা যাবে—

ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে
হাজার বছর ধরে
এগিয়েছে বাংলা ভাষা
লড়াই করে করে।[৭]

জন্মের পর থেকে বাংলা ভাষা বিরুদ্ধ-শক্তির সঙ্গে লড়াই করেছে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে। এ লড়াই করতে গিয়ে বাংলা ভাষার যত না শক্তি ক্ষয় হয়েছে, তারও অধিক নতুন শক্তির উন্মেষ ও সঞ্চয় ঘটেছে। সেই অর্থে হাজার বছরের অর্জন কম কিছু নয় এ ভাষার। নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথের দর্শন ও কাব্যকৃতি ধারণ করতে সক্ষম যে ভাষা, কাজী নজরুলের অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহের বাণী বহনের যোগ্য যে ভাষা, সে ভাষা তো মোটেই দীন দরিদ্র নয়। অস্তিত্বের লড়াই তাকে উজ্জ্বল করেছে, সমৃদ্ধ করেছে। মাইকেল মধুসূদনের ভাষায় আমরা বলতেই পারি—'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।'

জনম দুখিনি মেয়ের নাম বাংলা

আচ্ছা বন্ধুরা, তোমাদের কি জানতে ইচ্ছে করছে না—বাংলা ভাষার জন্ম কোথায় কবে কীভাবে? সেই গোড়া থেকেই আমরা বলছি—আজন্ম লড়াকু বাংলা, লড়াই করেই পথ কেটেছে নিজের জন্যে। সে লড়াইয়ের স্বরূপ ও চরিত্র বুঝতে হলে তো অবশ্যই এ ভাষার জন্ম বিষয়ে ধারণা থাকাটা জরুরি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে—

তোমার আমার জন্মের মতো ভাষার জন্ম নয়
ভাষার জন্ম সবার চোখের অগোচরেই হয়।[৮]

ভাষার জন্মের সঙ্গে নদীর জন্মের তুলনা করা চলে। পাহাড় থেকে নেমে আসার পর কত পথ কত জনপদ পাড়ি দিয়ে, বাধা বিঘ্ন ডিঙিয়ে তবেই এসে সাগরে মেশে। দীর্ঘ এই পথপরিক্রমায় এক সময় যে নদী গঙ্গা, সেই তো বাংলাদেশে ঢুকে পদ্মা নামে প্রবাহিত হয়, যেতে যেতে তারই শাখা-প্রশাখা আবার ভিন্ন ভিন্ন নামে পাড়ি দেয় বিস্তীর্ণ পথ। নাম বদলায়, আয়তন বদলায়, গতিপথ বদলায়, এই বদল ঠিক কবে কখন ঘটে, তা কি নির্দিষ্ট করে বলা যায়? ভাষার জন্ম পরিচয়ের বদল প্রক্রিয়াও লোকচক্ষুর আড়ালেই ঘটে, চোখে পড়ে তার সৃষ্টিসম্ভার। পৃথিবীর সব ভাষার ক্ষেত্রে এ কথা সত্য, প্রযোজ্য বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও। সৃষ্টিসম্ভার দিয়েই ফুটে ওঠে ভাষার পরিচয়। ওই সৃষ্টির মধ্যেই লুকানো থাকে ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার পরিচয়। আর সেটার সূত্র ধরেই চলে ভাষার বয়স নিরূপণের চেষ্টা।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সাহিত্যকৃতির নাম 'আশ্চর্যচর্যাবিনিশ্চয়'। সংক্ষেপে বলা হয় চর্যাপদ। এই তো মোটে শ'খানেক বছর আগে নেপালের রাজ দরবার থেকে এই চর্যাপদ আবিষ্কার করে আনেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এর আগে কোনো বাঙালি চর্যাপদের খবরই জানতেন না। শাস্ত্রী মশায় নেপাল থেকে বাংলায় এনে ঘোষণা করলেন—চর্যাপদ বাঙালির সম্পদ, চর্যাপদে যে জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে, তা প্রাচীন বাংলাদেশের অতি সাধারণ বাঙালির জীবনের ছবি এবং চর্যাপদের ভাষায় বাংলা ব্যকরণের সাধারণ কিছু নিয়ম প্রতিফলিত হয়েছে। তাই তিনি দাবি করলেন—চর্যাপদ বাংলার। মাথা ঘুরে গেল সব পণ্ডিতদের। শুধু বাঙালি পণ্ডিত নয়, বাংলা ভাষার প্রায় সমসাময়িক ভাষা নেপালি, গুজরাটি, মৈথিলি, ভোজপুরি প্রভৃতি ভাষার পণ্ডিতেরাও দাবি জানালেন চর্যাপদ তাদের ভাষায় লেখা, এ তাদের সম্পদ। শুরু হলো মহাবিতর্ক। পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তি প্রদর্শনের যুদ্ধ। অবশেষে জয় হয়েছে বাংলার।

সোনামণি, তোমাদের জানতে ইচ্ছে করছে না—চর্যাপদ কবে লেখা

হয়েছে! সে কথা কিন্তু একেবারে সাল-তারিখ মিলিয়ে বলা যাবে না। আধুনিককালের বইপত্রের যেমন পাতা উল্টালেই পাওয়া যায় প্রকাশের সময়, প্রকাশকের পরিচয়; সেকালে তো এসব ছিল না। বই কিসের, সে ছিল হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি! নেপালের রাজকীয় লাইব্রেরি থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছেঁড়া অবস্থায় আবিষ্কার করেন মাত্র সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ, তাও পূর্ণাঙ্গ নয়। কে বলবে তার রচনা কিংবা প্রকাশকালের খবর? তাহলে উপায়? চর্যাপদের সময়কাল জানতে না পারলে বাংলা ভাষার জন্মকাল জানা যাবে কীভাবে? বাংলা ভাষার সেরা সব পণ্ডিতেরা অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেন কিন্তু একমত হতে পারেন না। ভিন্ন ভিন্ন অভিমত তুলে ধরেন। সেই সব যুক্তিপূর্ণ অভিমতের কথা তোমাদের একটু পরে বলছি। তার আগে এসো জেনে নিই—বাংলা কেমন করে দুখিনি মেয়ে হলো।

দুখিনি বলে শুধু দুখিনি, বাংলা বড় অভাগিনীও বটে। ধনীর দুলালি সে নয়, অভিজাত কোনো উচ্চশ্রেণীতে তার জন্ম নয়, বেড়ে ওঠাও নয়। বাংলা ভাষার জন্ম একেবারে সাধারণ শ্রেণীতে। অতি সাধারণ মানুষের মুখে মুখে তার প্রচলন। সাধারণ মানুষ তার ধর্মের কথা মর্মের কথা, নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের কথা, গান কিংবা কবিতার কথা খুব অনায়াসে বাংলা ভাষাতেই প্রকাশ করেছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভিক্ষু সাধকেরা চর্যাপদ নামের গানে গানে ধর্মীয় সাধনতত্ত্বের কথা প্রকাশ করেছে খুব দরদ দিয়ে। সেটা ছিল পাল রাজাদের শাসনামল। সে আমলের পর সেনরাজারা ক্ষমতায় এসেই বাংলা ভাষা চর্চার বিরোধিতা করে, ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে হুমকি দেয়—বাংলা ভাষার চর্চা করলে 'রৌরব' নামের নরক অনলে জ্বলে-পুড়ে মরতে হবে। এমন ভয় দেখানোর পরও বাঙালি তার মাতৃভাষা বাংলাকে ছাড়েনি। শাসকদের অত্যাচারে দেশ ছেড়েছে তবু বুকের মধ্যে নিয়ে গেছে চর্যার গান। সে কারণেই বাংলার সম্পদ চর্যাপদকে খুঁজে পাওয়া গেল বাংলার বাইরে, নেপালে। শুধু কি চর্যাপদ, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য'ও পাওয়া যায় বাঁকুড়ার এক গোয়ালঘরে। আবিষ্কার করেন বসন্তরঞ্জন বিদ্যাবল্লভ। অভাগিনী বাংলা তার বুকের রত্ন আগলে রাখতে পারেনি আপন বুকে। তবে হ্যাঁ, ঘষে মেজে সংস্কার করা (যেমন হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়) হয়নি বটে, প্রাকৃতজনের মুখের ভাষা হিসেবে গৌড়ীয় প্রাকৃতের খোলস থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা বাংলা ভাষা তবু ঠিকই এগিয়ে চলে পথের বাধা সরিয়ে। রাজার আদর না পেলেও একেবারে নিচুতলার সাধারণ মানুষের বুক ভরা সমাদর পেয়েছে, ভালোবাসা পেয়েছে। এই যে

সাধারণ মানুষের ভালোবাসা, এতেই দুখিনি বাংলা মায়ের আঁচল সমৃদ্ধ হয়েছে, ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়েছে। সময়ের ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষা আজ বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে।

ছোট্ট বন্ধুরা, এখন ভাষা-আন্দোলন বা ভাষার লড়াইয়ের কথা বললে তোমাদের চোখে ভেসে ওঠে শহীদ মিনারের ছবি, হয়তো তোমাদের মনে পড়ে যায় ১৯৫২ সালের অমর একুশের শোকাবহ কাহিনী; সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তোমরা ঠাণ্ডা মাথায় বুঝে দেখ—বাংলা ভাষাকে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে একেবারে শুরু থেকেই। সে লড়াই চলছেই। এখনো চলছে। সময়ে সময়ে মাত্রাগত পরিবর্তন হয়তো ঘটেছে। এরই মাঝে বড় বড় অর্জনও ঘটেছে। তবু বাংলাবিরোধী ষড়যন্ত্রেরও শেষ হয়নি, তাই লড়াইও থেমে যায়নি।

ভাষার কথা : যথা তথা

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা এখন ছোট থাকতেই একাধিক ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠছ। নিজের মাতৃভাষা তো আছেই, শৈশবেই যুক্ত হচ্ছে ইংরেজি। আধুনিক মা-বাবা পিছিয়ে পড়তে চান না বলে শিশুর মুখে বাংলা বুলি ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি শব্দও ধরিয়ে দিতে চান। ফলে শিশুরা কলাকে কলা বলে চিনবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যানানা বলেও চিনিয়ে দেয়া হয়। এভাবেই মা, বাবা, গরু, গাধা, হাঁসমুরগি—চার পাশের সব কিছুর ইংরেজি প্রতিশব্দ শিখিয়ে দেয়া হয়। সেই সঙ্গে টেলিভিশন নামক যাদুর বাক্সের কল্যাণে আরো দু-একটি ভাষার সঙ্গেও বেশ পরিচয় ঘটে যাচ্ছে। শিশুর ক্রন্দন থামাতে গিয়ে টিভি-দুরন্ত মা যদি বলে ওঠে 'রোনা মাৎ বেটা' আমি অবাক হব না। ভাষা এভাবেই ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়তে চায়। ভাষার কাজ কী? মানুষের মনের ভাষা আশা-আকাঙ্ক্ষা মুখনিঃসৃত ধ্বনির সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা, অপরের কাছে পৌছে দেয়া। সহজ কথায় মানুষের মনের ভাব প্রকাশই ভাষার দায়িত্ব। অঙ্গভঙ্গি, বা ইশারা-ইঙ্গিতের সাহায্যে মানুষ বহুদিন এ কাজ চালিয়েছে। এরই মাঝে কান পেতে শুনেছে পাতার মর্মধ্বনি, বাতাসের শন্‌শন্ ধ্বনি, নদীর কুলুকুলু ধ্বনি, পাখিদের কাকলি ইত্যাদি। এই সময়ে মানুষের বাগযন্ত্রের নানাবিধ বিকাশ ঘটেছে এবং নানাবিধ ধ্বনি উচ্চারণে পারঙ্গম হয়ে উঠেছে। ধ্বনি দিয়ে মনের ভাব প্রকাশে সক্ষম হয়েছে। নিজের মুখনিঃসৃত ভাষা শুনে মানুষ নিজেই চমকে উঠেছে, আনন্দে আপ্লুত হয়েছে। অনুমান করা হয়, এখন থেকে পাঁচ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে ভাষার জন্ম হয়েছে। বাব্বা!

পাঁচ লক্ষ বছর মানে সে এক বিরাট ব্যাপার। নানাভাবে হিসেব করে ভাষা বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে, প্রধান অপ্রধান সব মিলিয়ে এই পৃথিবীতে তিন থেকে চার হাজার ভাষা আছে। এর মধ্যে ইংরেজি, চীনা, রুশ, ফরাসি, স্প্যানিশ, আরবি, ফার্সি, জাপানি, জার্মানি পর্তুগীজ, হিন্দি, উর্দু এবং আমাদের বাংলা ভাষা প্রধান ভাষা বলে পরিচিত।

পৃথিবীর দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে নানান ভাষার ব্যবহার দেখে মনে হতে পারে—এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার কতই না দূরত্ব। এদের মধ্যে কোনোকালে কোনো সম্পর্ক ছিল, সহজভাবে সে কথা কল্পনা করাও যায় না। কিন্তু মূল ব্যাপারটা আদৌ সে রকম নয়। ভাষায়-ভাষায় অন্তর্লীন সম্পর্ক তো একটা আছেই। ইতিহাস গবেষক ড. মোহাম্মদ হাননান আরো অনেক পণ্ডিতের মতোই দাবি করেন—পৃথিবীর সব ভাষাই এক মায়ের সন্তান। যেমন আমরা দুনিয়ার সব মানুষ ছিলাম একই পিতামাতা আদম হাওয়ার সন্তান, তেমনই ভাষাও ঠিক তাই। দেশে দেশে ছড়িয়ে আবহাওয়া-ভূগোল, পাহাড়-নদী ছাড়িয়ে অঞ্চলে অঞ্চলে ভাষায় এসেছে কিছুটা পার্থক্য; কিছুটা ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন মেজাজের ভিন্ন চেহারারও, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও রংও ধারণ করেছে জায়গা জমি মানুষ বুঝে।[৯] সময়ের ব্যবধানে, দেশের ব্যবধানে ভাষা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু দৃশ্যত যতই দূরের বলে মনে হোক, সম্পর্ক তাদের মধ্যে ঠিকই আছে।

ভাষার বাঁচা-মরা

ভাষা বাঁচে মানুষের মুখে মুখে প্রায়োগিক ব্যবহারে। মৌখিক ব্যবহার ছাড়াও অনেক ভাষার থাকে লিখিত ব্যবহার বা লেখ্যরূপ। তবে মৌখিক ভাষাই হচ্ছে আসল ভাষা, লিখিত ভাষা পরের ভাষা, কিছুটা কৃত্রিমও বটে। তোমরা ভেবে দেখ তো বন্ধুরা, মানুষের মুখে উচ্চারিত না হওয়া পর্যন্ত তা কি ভাষা হতে পারে? ভাষা মানেই তার শ্রুতিগ্রাহ্যতা থাকতে হবে। পৃথিবীর অনেক দেশে অনেক অঞ্চলে এমন অনেক ভাষা আছে যা কেবল মানুষের মুখে মুখেই উচ্চারিত হয়ে চলেছে, কিন্তু নেই কোনো লিখিত রূপ; এমন কি কারো আবার লেখার যোগ্য বর্ণমালাও নেই। এই ভাষাগুলো তো বেঁচে আছে মানুষের মুখেমুখেই।

* আবার এমন অনেক প্রাচীনকালের ভাষাও আছে, যেগুলো শুধুমাত্র লিখিতভাবেই টিকে আছে, কিন্তু বর্তমানে কেউ সে ভাষায় কথা বলে না। মানুষ যদি কথাই না বলে কেউ, সে ভাষা আর বাঁচে কী করে? তাকে বলে মৃতভাষা।

ল্যাটিন ভাষা এই রকম এক মৃতভাষা। ইউরোপ মহাদেশে একদা এ ভাষার দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল বটে, এখন আর নেই। এই ভাষায় এখন কেউ কথাও বলে না, কেউ লেখেও না। কাজেই অনেক আগেই মৃত্যু ঘটেছে এ ভাষার।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে ঘষে মেজে সংস্কার করে এক সময় পণ্ডিতেরা কৃত্রিম এক ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন, তার নাম সংস্কৃত ভাষা। একটি সম্প্রদায়ের কাছে এ ভাষার ধর্মীয় গুরুত্ব অনেক। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকীর্তিও রচিত হয়েছে এই ভাষায়। তবে বর্তমানে সংস্কৃত ভাষায় কেউ কথাও বলে না, লেখাপড়াও করে না বললেই চলে। কাজেই এ ভাষাকে এখন মৃতভাষাই বলা যায়।

ল্যাটিন বা সংস্কৃত মৃতভাষা হলেও এ দুটি ভাষার নাম এখনো নানা কারণে জীবিত। কিন্তু এই পৃথিবীতে এমন ভাষাও একদা ছিল, বর্তমানে নয়, বহু আগেই যার চর্চা থেমে গেছে; এমন কি সে ভাষার নামটুকুও হারিয়ে গেছে কালের অতল গর্ভে। এ ধরনের ভাষা যথার্থই মৃতভাষা।

ভাষার মরা-বাঁচা নিয়ে একটি মজার তথ্য জানিয়েছেন ড. মোহাম্মদ হাননান। ইতিহাস বলে—ভাষা মরে গেলেও আবার বাঁচতে পারে। যেমন কোনো একটি মৃতভাষা যদি কোনো অঞ্চলের লোক আবার ব্যবহার শুরু করে, তাহলে ভাষাটি আবারো বাঁচতে পারে। যেমন, হযরত নূহ (আ.)-এর আমলে একটি ভাষা ছিল হিব্রু ভাষা। কয়েক হাজার বছর ব্যবহারের পর ভাষাটি মরে যায়। কিন্তু বর্তমানে এই ভাষাটি আধুনিক ইসরাইলের ইহুদিরা আবার ব্যবহার করছে। ফলে হিব্রু এখন আর মৃতভাষা নয়।

বাংলা ভাষার বংশবুনিয়াদ

সোনামণি, তোমরা জানো তো মানুষের বংশ-পরিচয়ের মতো ভাষারও বংশ-পরিচয় থাকে। গাছের ডালপালার মতো ভাষাও ডালপালা মেলতে পারে। বড় বড় ভাষা-বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন পৃথিবীর প্রচলিত-অপ্রচলিত ভাষাগুলো নিয়ে। বিভিন্ন ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছেন। সেগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করেছেন। তারপর সব ভাষাকে কয়েকটি গোষ্ঠী বা বংশে ভাগ করেছেন। আমাদের বাংলা ভাষার জন্ম বেড়ে ওঠা পরিচর্যা মোটেই অভিজাত বা উঁচু শ্রেণীর মাধ্যমে ঘটেনি সে-কথা আমরা আগেই বলেছি। তবে তার বংশ-পরিচয় কম কিছু নয়। পণ্ডিতদের মতে বাংলা ভাষা যে বংশের মধ্যে পড়ে, তার নাম হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশ। একে ভারতীয় ইউরোপীয় ভাষা বংশও বলা যায়। বাংলা তো একা নয়, তার

সহোদর ভাইবোন আছে, বাপ-চাচা আছে, মা-খালা আছে; আছে সব রকম আত্মীয়স্বজন। হ্যাঁ, মানুষের মতোই প্রায়। বাংলা ভাষার পূর্বপুরুষের বংশও নানান সময়ে এদিক সেদিকে নানা রকম বংশ ছড়িয়ে ডালপালা মেলেছে।

ভাষা বংশের নাম বলেছি ইন্দো-ইউরোপীয়। বাংলা এই বংশেরই সদস্য। এদের মধ্যে দূরত্ব কতখানি জানো? এই মনে কর—বাংলা ভাষার দাদার দাদা হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী। এই ভাষাগোষ্ঠীর নাতি-পুতি হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। এখান থেকে এসেছে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা বা প্রাকৃত ভাষা। আবার এদেরই সন্তান হচ্ছে অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ ভাষা। ছোট্ট বন্ধুরা, এইখানে এসে একটু শান্ত হয়ে দাঁড়াও। প্রাকৃতের পরে এই অপভ্রংশ—এ হচ্ছে আমাদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই, আমাদের অনেকগুলো ভাইবোনের একত্রে দাঁড়াবার জায়গা। আমাদের বাংলা ভাষা তো আছেই, কারা সেই অন্যান্য ভাইবোনেরা? তারা হচ্ছে হিন্দি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, বিহারী, অসমীয়া ইত্যাদি। এরাই হচ্ছে বাংলা ভাষার ভাষাতুতো ভাইবোন। এদের শব্দ ভাণ্ডারে অনেক মিল আছে, পদবিন্যাসের ব্যকরণে অনেক মিল আছে; মানুষের যেমন চেহারায় রক্তে মিল থাকে, অনেকটা সেই রকম। অসমীয়া ভাষা হচ্ছে বাংলা ভাষার আপন বোন। আর হিন্দি, পাঞ্জাবিকে বলা যায় বাংলা ভাষার চাচাতো খালাতো কিংবা ফুফাতো বোন। হ্যাঁ, বংশের আত্মীয়রা এমনই। দূরে তবু দূরে নয়। ভালো করে কান পাতলেই ভাষার এ আত্মীয়তা বেশ টের পাওয়া যায়, অনুভব করা যায়।

তবে বাংলা ভাষার পূর্বপুরুষের পরিচয় নিয়ে বাঙালি পণ্ডিতদের মধ্যে বেশ খানিকটা মত-পার্থক্য আছে, বিতর্ক আছে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম শুনেছ তোমরা? বাংলা ভাষার অনেক বড় পণ্ডিত, ভাষা বিজ্ঞানী। তিনি দাবি করেছেন—মাগধী প্রাকৃত থেকে এসেছে পূর্বমাগধী অপভ্রংশ; আর এখান থেকেই অর্থাৎ এই পূর্বমাগধী অপভ্রংশের খোলস ভেঙেই বেরিয়ে এসেছে বাংলা ভাষা।

আমাদের দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি। অনেক যুক্তিশেষে তিনি অভিমত জানান—মাগধী প্রাকৃত থেকে তো নয়, বাংলা ভাষা এসেছে গৌড়ী প্রাকৃতের মধ্যমে। গৌড়ী প্রাকৃতের পরের ধাপ হচ্ছে গৌড়ী অপভ্রংশ বা অবহট্‌। আর তারপরই আমাদের বাংলা ভাষা। মোদের গরব মোদের আশা। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো আরো অনেক পণ্ডিত এ বিতর্কে অংশ নিয়েছেন এবং তাঁদের আপন

আপন যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। এ বিতর্ক এখানেই থেমে থাকেনি, বাংলা ভাষার বয়স নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে।

বাংলা কি সংস্কৃত ভাষার দুহিতা?

আমাদের দেশেই একদল মানুষ (তাদের মধ্যে পণ্ডিতও ছিল) বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার দুহিতা বলে প্রচার করতেন। জানো তো—দুহিতা মানে কন্যা। তাদের মতে সংস্কৃত হচ্ছে বাংলার জননী। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ তত্ত্বের বিরোধিতা করে বলেছেন, এই দুই ভাষার সম্পর্ক মা-মেয়ের মতো নয়। তবে আত্মীয়তার সম্বন্ধ ঠিকই আছে। আর বিভ্রান্তিটা তৈরি হয়েছে এখান থেকেই। তাছাড়া রাজনৈতিক মতলব থেকেও হয়তো বা কেউ এই প্রচারণার পালে হাওয়া দিতে পারে।

এই যে কিছুক্ষণ আগে বাংলা ভাষার বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা'র নাম বলেছি, মনে আছে সোনামণি? ওই যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার পরে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা হয়ে প্রাকৃত; সেই প্রাকৃতেরই একটি শাখা গোড়ী প্রাকৃতের অপভ্রংশ থেকে এসেছে বাংলা ভাষা।

শুরু করতে চাই 'প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা'র প্রসঙ্গ দিয়ে। না, তারও আগে তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—গোটা ভারতবর্ষ (আমাদের বাংলাসহ) আদিতে ছিল অনার্যদেরই দেশ, সেই প্রাচীনকালে পশ্চিম থেকে আসে আর্যরা। চেপে বসে অনার্যদের কাঁধে। শিক্ষিত সভ্য বলে প্রচার করে নিজেদের। সে সময়ে গড়ে ওঠে 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা'। এ ভাষাকে অনেকে বলে বেদ-এর ভাষা। বৃহৎ অর্থে আমাদের দেশের প্রাচীন বই ঋগ্বেদ (ধর্মগ্রন্থ) লেখা হয় এই ভাষায়। বেদ যেহেতু ধর্মগ্রন্থ, তা নিশ্চয় ঐ ধর্মের অনুসারী এবং সবার জন্যই পাঠের সুযোগ ছিল। শত শত বছরে বেদ-এর ভাষা ঐ বেদ গ্রন্থেই আটকে থাকে, কিন্তু মানুষের মুখের ভাষা তো সর্বদা প্রবহমান, একেবারে নদীর ধারার মতো। শত শত বছরের প্রবহমানতায় মুখের ভাষা এতদূর এগিয়ে এসেছে যে সময়ের এই দীর্ঘ ব্যবধানে সাধারণ মানুষ আর বুঝতেই পারে না বেদ-এর ভাষা। ধর্মানুভূতির কারণে বেদ-এর প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও ভাষার দুর্বোধ্যতার কারণে মানুষ আর জানতেই পারে না—কী লেখা আছে এই পবিত্র গ্রন্থে। আরো বেশ কিছু সময় পরে জানার অধিকারটুকুও কেড়ে নেয় সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষ, কর্তাব্যক্তিরা। সাধারণ মানুষ, নিম্নবিত্তের মানুষের জন্যে তারা নিষিদ্ধ করে দেয় বেদ-এর ভাষা। শুধু কি নিষিদ্ধ, জনশ্রুতি আছে, বেদ-এর ভাষা যেন কিছুতেই শুনতে না পায় সেই

উদ্দেশে তারা সীসা গরম করে করে নিম্নবর্গের মানুষের কানে ঢেলে দেয়ার মতো নিষ্ঠুর ব্যবস্থাও করে।

এমনিতেই শত শত বছর সময়ের ব্যবধানে বেদ-এর ভাষার সঙ্গে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার বিস্তর দূরত্ব সৃষ্টি হয়, সেই সঙ্গে বেদ-চর্চার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারির ঘটনা আরো দূরত্ব রচনা করে। এরপরে একদল পণ্ডিত আরো ভয়ানক এক ঘটনা ঘটিয়ে বসলেন। বেদ-এর ভাষাকে বেশখানিক ঘষামাজা করে বিশেষ সংস্কার ঘটালেন। এইসব সংস্কারের পর তার নাম হলো সংস্কৃত ভাষা। এবার মুখের ভাষার সঙ্গে আরো যোজন যোজন দূরত্ব বেড়ে গেল লিখিত এই সংস্কৃত ভাষার। এ ভাষা কেবল উচ্চশ্রেণীর লেখ্যচর্চার মধ্যে সীমিত হয়ে রইল। তবু অভিজাত আর্যভাষা বলে কথা।

এই সব কৃত্রিম অভিজাত্যের বাইরে ধুলোমাটি মাখা সাধারণ মানুষের মুখে মুখে তখন যে ভাষাটি প্রচলিত ছিল তার নাম পালিভাষা। মহামতি গৌতম বুদ্ধ এই সাধারণ ভাষাতেই প্রচার করলেন তাঁর ধর্মকথা, রচনা করলেন 'ত্রিপিটক'। বলতে গেলে তথাকথিত অভিজাত ভাষার বিরুদ্ধে মুখের ভাষার এটাও এক প্রকার বিদ্রোহ। পালিভাষার পরে প্রাকৃতভাষা হয়ে আরো পরে এসেছে বাংলা ভাষা; জন্মের পর থেকে তাকেও লড়াই করেই টিকে থাকতে হয়েছে; এ লড়াইয়ের নেপথ্য প্রেরণা হয়ে হয়তো বা কাজ করেছে গৌতমবুদ্ধের সেই বিদ্রোহ। স্থানীয় মানুষের মুখের ভাষার প্রতি এমন উচ্চমর্যাদা তাঁর আগে আর কেউ দেয়নি। অভিজাত আর্যভাষাকে মোকাবিলা করে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা কি সোজা কথা! বাংলা ভাষা তো এসেছে এই অনভিজাত সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রবহমান ভাষাস্রোতের ধারা থেকেই। এখন তাহলে তোমরাই হিসেব করে বলো তো বন্ধুরা, সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক কতটুকু এবং কেমন? আদৌ কি মাতা-কন্যার সম্পর্ক বলা যায়?

ভাষাতাত্ত্বিক ও বহুভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ সম্পর্ককে 'আত্মীয়স্বজন' পর্যন্ত স্বীকার করলেও সংস্কৃত ভাষাকে বাংলা ভাষার জননী বলে মোটেই স্বীকৃতি দেননি। বরং তিনি দুটি ভাষা থেকে একাধিক শব্দের উদাহরণ তুলে অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়নি। এসো, কয়েকটি শব্দের উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা আমরাও হাতে-নাতে প্রমাণ করে দেখি। বাংলা ভাষার গাছ শব্দটি এসেছে প্রাকৃত ভাষার 'গচ্ছ' থেকে, সংস্কৃত ভাষার বৃক্ষ থেকে নয়। বাংলা নাক এসেছে প্রাকৃতের 'নক্ক' থেকে, সংস্কৃতের নাসিকা থেকে নয়। ধরা যাক বাংলা ভাষার

বাবা কিংবা বাপ শব্দটির কথা। এটা নিশ্চয় সংস্কৃতের 'পিতা' শব্দ থেকে আসেনি, এসেছে প্রাকৃতের 'বপ্প' শব্দ থেকে। এ রকম আরো অনেক শব্দের দৃষ্টান্ত দেখানো যায়।

শব্দ কীভাবে দীর্ঘ সময় ধরে একটু একটু করে চেহারা বদলায়? এখন আমরা সেটা দেখাতে চেষ্টা করব একটি বাক্যের বিভিন্ন ভাষায় পরিবর্তনের রূপ তুলে ধরার মধ্য দিয়ে। ছোট্ট সোনামণি, একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ কর।

ছোট্ট একটি বাক্য—'তুমি আছ।' আধুনিক বাংলায় এভাবেই বলা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ মাত্র দুটি শব্দের বাক্যটি বর্তমান সময়েও বিভিন্নভাবে উচ্চারণ করছে। বাক্যটি বরিশালের মানুষের মুখে যেমন শোনাবে, সিলেট বা চট্টগ্রামের মানুষের মুখে ঠিক তেমন শোনাবে না, শোনাবে ভিন্ন ভিন্ন রকম উচ্চারণে। তবু বর্তমান বাংলা ভাষার প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে 'তুমি আছ।' তোমরা কি ভাবতে পার—এই বাক্যটি এক হাজার, দুহাজার কিংবা তিন হাজার বছর আগেকার মানুষের মুখে কেমনভাবে উচ্চারিত হতো? সেই উদাহরণটা দিই।

প্রাচীন প্রাকৃতে (পালিও বলা যায়) বাক্যটি ছিল—তুমহে অচ্ছথ, মধ্যপ্রাকৃতে পরিবর্তন হলো এ রকম : তুমহে অচ্ছহ। প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষায় হলো : তুমহে আছহ, মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় : তুহ্মি আছহ। শেষে আধুনিক বাংলায় : তুমি আছ। এ পরিবর্তন কোনো পণ্ডিতের হাতে হয়নি, হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে জনসাধারণের মুখে মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তোমরাই বলো—এর মধ্যে সংস্কৃতের স্থান কোথায়? তবে হ্যাঁ, বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ আছে। সে তো ইংরেজি, ফারসি, তুর্কি, আরবি উর্দু প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দই আছে বাংলায় মিশে, প্রতিনিয়ত আমরা তা অনায়াসে ব্যবহারও করছি। ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এ রকম কত বিদেশি শব্দ যে আমাদের আপন হয়ে গেছে, তার কি ঠিক আছে! তাই বলে সংস্কৃত ভাষা তো বাংলা ভাষার জননী হতে পারে না!

দীর্ঘ সময়ের স্রোতে শব্দ কীভাবে চেহারা বদলায় লক্ষ করেছ নিশ্চয়। হাজার বছর বা তারও আগে এ দেশের মানুষ 'মঁই তেন্তিলী খাইল্লী' বলে বুঝাতো আমি তেঁতুল খেলাম। তোমরা কি আজ কল্পনা করতে পার—এই বাক্যটিই আগামী এক হাজার বছর পরের বাঙালি চাষী অথবা কোনো এক চাষীবধূ কীভাবে বলবে? প্রাচীন 'মঁই' বর্তমানে আমি হয়েছে, 'তেন্তিলী' হয়েছে তেঁতুল, খাইল্লী থেকে খাইলাম হয়েছে, কে বলবে হাজার বছর পরে কেমন হবে শব্দগুলো!

ভাষার লড়াই : গোড়ার কথা

আমাদের এই দেশ, মানে সেদিনের গোটা ভারতবর্ষ পশ্চিম থেকে আর্যরা এসে দখল করে নিলে স্থানীয় সাধারণ মানুষ বা অনার্যদের সঙ্গে সামাজিক জীবনের নানা ক্ষেত্রেই সংঘাতের সৃষ্টি হয়। হবে না কেন? তারা আভিজাত, এরা অতি সাধারণ; তারা সভ্য-ভব্য, এরা অসভ্য-অভব্য। তেলে-জলে কখনো মেশে! মিশবে কী করে! তারা তো সব সময় এদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে, অবজ্ঞার চোখে দেখেছে। তবু এদের মধ্য থেকে বেশ কিছু মতলবাজ, সুবিধাবাদী, দালাল, আমলা অতিদ্রুত নিজেদের ভাগ্যপরিবর্তনের উদ্দেশে গায়ে পড়ে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে। এভাবেই গড়ে ওঠে দেশীয় দালালশ্রেণী। যে-কোনো লড়াই সংগ্রামে এই দালাল শ্রেণী পালন করে জঘন্য ভূমিকা, গ্রহণ করে প্রভূতোষণ নীতি, দাঁড়িয়ে যায় বিদেশী প্রভুদের পক্ষে। নতুন কিছু নয়, চিরদিনই এমন হয়, ভাষার লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও তেমনই হয়েছে।

তোমাদের মনে আছে তো প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা, মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার কথা? এগুলো তো আর্যদের ভাষা, এ ভাষায় লেখা হয় বেদ, শত শত বছর ধরে সেই বেদ পঠিত হয়; কিন্তু অনার্যদের ভাষা কোনটা? বেদ এর ভাষা বুঝুক না বুঝুক এইসব সাধারণ মানুষের জন্যে তো সে ভাষা শোনাও নিষিদ্ধ করে দিল; তাহলে এদের ভাষা ব্যবহারের কী হলো—ভেবেছ বন্ধুরা? সহজ কথায় এই সব অনভিজাত সাধারণ মানুষের মুখে মুখে যে ভাষা প্রবাহ ছিল, অভিজাত পণ্ডিতের স্পর্শমুক্ত সেই মুখের ভাষা-ই সময়ের স্রোত মোকাবিলা করে টিকে থাকে। সামনে এগিয়ে যায় এবং মহামতি গৌতমবুদ্ধ এই মৌখিক ভাষাতেই (তখন পালি নামে প্রচলিত) রচনা করেন ত্রিপিটক। বলা যায় আমাদের দীর্ঘ ভাষার ইতিহাসে এটাই প্রথম বিদ্রোহ। ভাষা বাঁচে মুখের উচ্চারণে। অভিজাত শ্রেণীর লেখ্যভাষার দিকে না গিয়ে গৌতমবুদ্ধ সম্মানিত করলেন জনসাধারণের মুখের ভাষাকে। এ এক যুগান্তকারী ঘটনা বটে। হোক অনভিজাত স্থানীয় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা, তবু লাখো কোটি মানুষের মুখে মুখে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হয় বলেই তাতে পাওয়া যায় প্রাণের স্পন্দন এবং উষ্ণতা। ফলে টিকে থাকার স্বার্থে এবার স্থানীয় এই মুখের ভাষার সাথে নিরব যুদ্ধে নামতে হয় আর্যভাষাকে। দিনে দিনে সে যুদ্ধে পর্যদুস্ত হতে হয়। ভাঙন দেখা দেয় পশ্চিমের এই আর্যভাষায়।

এদিকে জনসাধারণের মুখের ভাষার ধারাটি কিন্তু হাজার বছর ধরে প্রবাহিত হয়ে পালি থেকে প্রাকৃতে আসে, আবারো হাজার বছরের প্রবাহধারায়

পরিণত হয় প্রাচীন বাংলায়, সেখান থেকেও হাজার বছরের ঘষামাজার মধ্য দিয়ে পৌঁছে আধুনিক বাংলা। শুধু বাংলা নয়, বাংলার সহোদরা বোনের মতো অন্যান্য ভাষাগুলোও এই মুখের ভাষার ধারা থেকেই উৎসারিত হয়েছে। পশ্চিমের অভিজাত লিখিত ভাষার সঙ্গে পূর্বের অনভিজাত জনসাধারণের মুখের ভাষার লড়াইয়ের ধারাবাহিকতা থেকেই জন্ম হয়েছে আমাদের গৌরবের বাংলা ভাষার। হ্যাঁ, ভাষার লড়াই থেকেই জন্ম বাংলা ভাষার, আবার জন্মের পর থেকেও তাকে লড়াই করেই টিকে থাকতে হয়েছে প্রতিনিয়ত। বাংলা ভাষাকে তাই আমরা বলতে পারি বিদ্রোহী ভাষা, লড়াকু ভাষা। কিন্তু এ ভাষার বয়স কত—প্রশ্ন জাগে না তোমাদের?

বাংলা ভাষার বয়স

তোমরা নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবে যে কারো বয়স জানতে হলে তার জন্ম তারিখ বা জন্মের সময় সম্পর্কে জানাটা খুব জরুরি। মানুষ কিম্বা পশুপাখি বা অন্য প্রাণির ক্ষেত্রে সেটা খুব সমস্যা নয়। একটু বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়ে নজর রাখলে জন্মের সাল-তারিখ টুকে রাখা সম্ভব। কিন্তু ভাষার জন্মের দিন ক্ষণ তো সেইভাবে জানা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা অনেকটা নদীপ্রবাহের মতো। গঙ্গার জন্ম কবে, অথবা গঙ্গা কবে পদ্মা হলো, অথবা পদ্মা কবে যমুনার সঙ্গে মিলিত হলো—কে বলবে সেই দিন তারিখ? এ যে শুধুই প্রবহমান। ভাষাও তো তাই। মানুষের মুখে মুখে কথায় কথায় বয়ে চলেছে ভাষার স্রোত। কবে থেকে তার নাম পালি, কিংবা প্রাকৃত, কখন হলো গৌড়ী প্রাকৃত, কখনই বা তার অপভ্রংশ থেকে বেরিয়ে এলো বাংলা, সে কথা নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। এমতাবস্থায় ওই ভাষায় রচিত বইপুস্তক কিংবা অন্য কোনো স্মারক চিহ্নের উপরেই নির্ভর করতে হয়। আমাদের অবলম্বন হচ্ছে চর্যাপদ, বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। এ নিয়ে আমরা ভিন্ন অধ্যায়ে (জনম দুখিনি মেয়ের নাম বাংলা) আলোচনা করেছি। এখন চর্যাপদের বয়স নির্ণয়টা-ই মুখ্য বিষয়। জানা দরকার চর্যাপদের জন্ম কখন, কেমন প্রেক্ষাপটে।

প্রিয় সোনামণি, আরেকটি বিষয়ে তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। নিশ্চয় তোমরাও একমত হবে যে কোনো শিশুর মাথায় বোঝা চাপানো চলে না—বোঝা বইবে কী করে শিশু? বইবার মতো বয়স হলে সে নিশ্চয় বোঝা বইবে, আরো অনেক কিছুই করবে। তেমন ভাবেই বলা যায় ভাষার কথাও। একটি ভাষা নতুনভাবে বাঁকবদলের পরপরই সুন্দর সাহিত্যকীর্তি সৃষ্টি করতে

পারে না। অনেক অনেক বছরের ব্যবহারে ভাষা যখন মসৃণ হয়ে ওঠে, প্রাণসম্পদে ভরপুর হয়ে ওঠে, তখন সে ভাষার কাব্য কবিতা-সাহিত্য রচনার যোগ্য হয়। এই কথাটিকে উল্টিয়েও বলা যায়। যে কোনো ভাষায় প্রাচীনতম সাহিত্যকীর্তিটি রচিত হবারও অনেক অনেক আগে থেকে ওই ভাষা মানুষের মুখে মুখে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফলে বলতেই পারি—সাহিত্যের জন্মের অনেক আগেই ভাষার জন্ম ঘটে।

বাংলা ভাষার বয়স নির্ণয়ের স্বার্থে কেন আমাদের চর্যাপদের উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে সে কথা আমরা আগেই বলেছি। চর্যাপদ হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভিক্ষুদের মুখে মুখে গাওয়া গান। এ গানে বৌদ্ধদের ধর্মতত্ত্বের কথা যেমন আছে, তেমনি আছে তৎকালীন বাঙালি সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র। একটি চর্যাতে বলা হচ্ছে :

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী

প্রাচীন বাংলার বাক্যগঠন, তবু খুব কি অচেনা মনে হচ্ছে? এক দরিদ্র মা বলছে—টিলার পাশে আমার ঘর, কোনো প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, তবু নিত্য নতুন অতিথি ঠিকই আসে। তুমি হয়তো আধুনিক বাংলায় রূপান্তরের সময় কবিতাও লিখতে পার :

টিলার পাশে ঘরটি আমার
পড়শি তো নেই মোটে
হাঁড়িতে ভাত নেই কো তবু
অতিথি ঠিক জোটে।[১০]

চর্যাপদের সমাজতাত্ত্বিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার জন্মকাল সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করেছেন, তবে একেবারে একমত হতে পারেননি। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, প্রাকৃতভাষা থেকে অপভ্রংশের খোলস থেকে বাংলা ভাষা যখন জন্ম নেয়, তখন ৯০০ থেকে ৯৫০ খ্রিস্টাব্দ হবে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দাবি করেন—বাংলা ভাষার জন্ম আরো পিছনে হবে। তাঁর মতে, এটা ৬০০ থেকে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ হবে। ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরাই হিসেব কর, বর্তমান সময় থেকে ৬০০ বা ৬৫০ বছর বিয়োগ করলে প্রায় হাজার দেড়েক বছরের ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে। আশা করি বুঝতে পেরেছ, আমাদের এই বাংলা ভাষার বয়স প্রায় দেড় হাজার বছরের কাছাকাছি। আগেই বলেছি জীবিত ভাষা যত প্রাচীন হয় ততই তার ধারণ, বহন এবং প্রকাশ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আমাদের বাংলা ভাষা

এখন বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পসাহিত্য—মানুষের অধীত সব বিদ্যাকে ধারণ এবং প্রকাশে সক্ষম। এ ভাষার শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা তাদের কর্ম দিয়ে কীর্তি দিয়ে প্রতিনিয়ত উজ্জ্বল করে চলেছেন মাতৃভাষার মুখ। আমরা এখন গর্ব করে বলতেই পারি, আমাদের বাংলা ভাষা যেমন বয়সে প্রাচীন, প্রকাশ ক্ষমতায় তেমনি আধুনিক, প্রবাদ প্রবচনসহ নানাবিধ প্রাণ প্রাচুর্যে তেমনি ভরপুর। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষা অন্যতম। জন্মকালে এ ভাষা রাজা রাজড়ার আনুকূল্য বা পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি, সমাজের উচ্চশ্রেণীর কাছে সমাদর পায়নি, পণ্ডিতের হাতের স্পর্শ পায়নি; পেয়েছে সাধারণ মানুষের ভালোবাসা, তারাই মুখে মুখে বয়ে চলেছে এ ভাষা, তারাই মুখের ভাষাকে পৌঁছে দিয়েছে লিখিত ভাষার দুয়ারে। এখন সকল বিবেচনায়, পরিপূর্ণ এক ভাষার নাম বাংলা ভাষা।

বাংলা ভাষা : অস্তিত্বের লড়াই যুগে যুগে

বাংলা ভাষা যে দেশের জনসাধারণের মুখে মুখে ব্যবহৃত আটপৌরে ভাষা প্রবাহ থেকে জন্ম নিয়েছে, সে কথা বহুবার বলা হয়েছে। জন্ম শুধু নয়, দীর্ঘকাল এ ভাষা পরিচর্যাও পেয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে। আর অনাদর অবহেলা অবজ্ঞা পেয়েছে দেশের হর্তাকর্তা তথা ক্ষমতাধর শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে। সময়ে সময়ে তাদের সে অনাদর বা ঘৃণা নির্মম নিপীড়ন বা অত্যাচারে পরিণত হয়েছে। এত নিষ্ঠুর অত্যাচারেও মাথা নত করেনি বাঙালি, ছাড়েনি মাতৃভাষার চর্চা বরং বুকের মধ্যে লালন করেছে গভীর মমতায়। শুধু অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই নয়, তাদের সযত্ন পরিচর্যায় বাংলা ভাষা দিনে দিনে পত্রপুষ্পে পরিপূর্ণ হয়েছে। তাই বলে বৈরিতা বা শত্রুতা শেষ হয়ে যায়নি।

এ বৈরিতার সূচনা একেবারে গোড়া থেকেই। সমাজের অতি সাধারণ স্তরের মানুষের (তারাই দেশের জনগণ) মুখের ভাষায় (বাংলায়) কবিদের কাব্যচর্চা, গায়কদের গান গাওয়া মোটেই সহজভাবে গ্রহণ করেনি সমাজের উঁচুতলার অভিজাত মানুষেরা। তারাই দেশ চালায়, সমাজ চালায়, তাদের হুকুম মানেই আইন। তারা সংস্কৃত ভাষার পক্ষে। তারা কড়া আইন জারি করল—বাংলা ভাষার চর্চা চলবে না। এ আইন মানেনি দেশের মানুষ। তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে শাসকেরা ভয় দেখাল—বাংলা ভাষায় কথা বললে বা কবিতা চর্চা করলে 'রৌরব' নামক কঠিন নরকের আগুনে পুড়তে হবে। হ্যাঁ, জনগণকে দাবিয়ে রাখার জন্য শাসকেরা ধর্মের অপব্যবহার হাজার বছর আগেও করেছে, এ রীতি এখনো বহাল আছে। এ দেশের সাধারণ মানুষ

কখনোই মাথা নোয়ায়নি অন্যায় আদেশের কাছে। ধর্মের ভয় দেখিয়েও লাভ হয়নি। এ দেশে তখন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের শাসনামল শেষে গোঁড়া হিন্দু সেন রাজাদের শাসনকালের শুরু হয়েছে। তারা ধমক দিয়ে, ভয় দেখিয়ে জনগণকে দমাতে না পেরে নিষ্ঠুর অত্যাচার চালায়। ফলে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয় আদি বাঙালিরা। দেশ ছাড়ে, তবু ভাষা ছাড়েনি, মুখের ভাষায় রচিত চর্যাপদ সঙ্গে নিয়ে যায় নেপালে। হয়তো আরো কোনো দেশেও তারা তখন গিয়ে থাকবে। এখন আর সে সব জানা যায় না। এই তো ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে চর্যাপদ আবিষ্কারের ফলে অনুমান করা সম্ভব হয় যে তখন জনগণ প্রাণভয়ে নেপালে আশ্রয় নেয়। চর্যাপদ না পেলে আমাদের জানাই হতো না যে বাংলা ভাষার ইতিহাস এত প্রাচীন।

আপন অস্তিত্বের স্বার্থে প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার এই যে লড়াই সংগ্রাম, মধ্যযুগে এসেও তার অবসান হয়নি। আর সে কারণেই মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যকৃতি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' খুঁজে পাওয়া গেল বাঁকুড়ার এক গোয়ালঘরে। বাংলার আর এক পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন বিদ্যাবল্লভ ১৯০৯ সালে আবিষ্কার করেন এই অসাধারণ কাব্যটি। এটা বুঝা যায় যে কারো হুমকি বা ভয়ভীতিতে বাংলা ভাষার কাব্যচর্চা থেমে থাকেনি। তবে অমূল্য এসব সাহিত্যকীর্তি যেখানে থাকার সেখানে রাখা যায়নি, লুকিয়ে রাখতে হয়েছে। কে জানে এমনই লুকানো কোনো সাহিত্য সম্পদ আরো কত জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিনা। এ কথা ভেবে আজ আমরা শিহরিত হই—আমাদের পূর্বপুরুষেরা মাতৃভাষার জন্যে ঘর ছেড়েছে, দেশ ছেড়েছে, তবু সে ভাষার (বাংলা ভাষার) সাহিত্য চর্চা ছাড়েনি। ছোট্ট বন্ধুরা, মধ্যযুগের বাঙালিরা কেমন করে কথা বলেছে, কবিতা লিখেছে, নিচের উদাহরণ থেকে একটুখানি দেখে নাও। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে লেখা হয়েছে :

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥

খুব অস্পষ্ট বা অচেনা মনে হচ্ছে কি? এখানে মাত্র দুটি শব্দ মধ্যযুগীয় চেহারায় আছে। 'বাএ' মানে 'বাজায়', 'নই' মানে নদী। এবার দ্যাখ—পুরোটাই স্পষ্ট। কবিতায় বলা হয়েছে—বড়াই, কালিন্দী নদীর কূলে গোকুলে বসে কে বাঁশি বাজায়? এই রকম মধুর কাব্যধারা বাংলা ভাষায় অব্যাহত থেকেছে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে। বাংলা ভাষা লড়াই করেই প্রাচীন ও মধ্যযুগের দুঃসহ দুঃসময় পাড়ি দিয়েছে, নতুন নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে এগিয়েছে সামনের পথে। লড়াই থামেনি বাংলা ভাষার।

তুর্কি শাসন : বাংলা ভাষার প্রথম অভিষেক

বাংলাকে আমরা বলেছি জনম দুখিনি মেয়ে। রাজনন্দিনী সে নয় বলে তার রাজকীয় অভিষেক ঘটেনি। বরং আমরা দেখেছি তার কপালে জুটেছে রাজনিগ্রহ। শত নিগ্রহেও তার পথ চলা থামেনি। পাথর ছড়ানো পথে সে চলেছে রক্ত ঝরিয়ে পায়ে। সে চলেছে সাধারণ মানুষের বুকের ভালোবাসা নিয়ে।

১২০০ সালের পর বাংলাদেশে তুর্কি শাসন শুরু হলে বাংলা ভষার ভাগ্যে এলো পরিবর্তন। ধর্মপরিচয়ে তুর্কিরা ছিল মুসলমান। ফারসি তাদের মুখের ভাষা। মুসলিম হিসেবে আরবিতেও আছে বিশেষ দখল। তবু ফারসিকেই তারা রাজভাষা করে। কিন্তু মজার বিষয় হলো—এ দেশের জনগণের মুখের ভাষা বাংলার প্রতি তারা অবহেলা বা অবজ্ঞা করেনি মোটেই। বরং এই প্রথম তুর্কি শাসকেরা বাংলা ভাষার কবিদের ডেকে এনে রাজসভায় স্থান দেয় সম্মানে, সমাদর করে আন্তরিকতার সঙ্গে। কারণ যা-ই থাক, এমন ঘটনা বাংলা ভাষার জীবনে এই প্রথম। এই প্রথম মাঠ-ঘাট-পথ-প্রান্তর থেকে বাংলা ভাষা উঠে এলো রাজদরবারে। রাজকীয় প্রশ্রয় এবং উৎসাহ পেয়ে বাংলা ভাষার কবিসাহিত্যিকেরা নতুন উদ্যমে শুরু করে কাব্যচর্চা। বাংলা ভাষায় জন্ম হলো নানা ধরনের নতুন নতুন কাব্য।

কিন্তু বাংলা ভাষা যে জনম দুখিনি। তার ভাগ্যে এত সুখ সইবে কেন! শুরু হলো ফের ষড়যন্ত্র। এই দেশেরই তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ও উন্নতি সহ্য করতে পারে না। সেই প্রাচীন যুগে তারা দাঁড়িয়েছিল সংস্কৃত ভাষার পক্ষে, এবার মধ্যযুগে তারা পক্ষ নেয় তুর্কি ফারসি ভাষার দিকে। আসলে তাদের কোনো নিজস্ব পক্ষ নেই। এই শ্রেণীর মানুষ চিরকাল ক্ষমতার পক্ষে। রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে তুর্কিরা, রাজভাষা ফারসি; শাসকদের দালালি করে অতি দ্রুত নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে এই শ্রেণীর লোকেরা তুর্কি ফারসি ভাষা শিখে ঢুকে পড়ে রাজদরবারে। চাকরি বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা—কৌশলে হাতিয়ে নেয় সবকিছু। আর ষড়যন্ত্র পাকিয়ে বাংলা ভাষার প্রতি ঘৃণা ছুঁড়ে দেয়, রাজকীয় আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত করে বাংলা ভাষাকে। আবার নেমে আসে অবহেলা বাংলা ভাষার ভাগ্যে। এই দালাল শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা জানাতেই সতের শতকের কবি আব্দুল হাকিম সেই বিখ্যাত 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি রচনা করেন।

তবে এ সময়ের মুসলিম কবিদের হাত ধরে বাংলা কাব্যধারায় বৈপ্লবিক এক বাঁকবদল ঘটে যায়। এতকাল ধর্মতত্ত্ব অথবা দেবমহিমা প্রচারই ছিল

বাংলা কবিতার প্রধান উপজীব্য, এবার সেখানে এলো মানুষের কথা; মানবিক প্রেম-বিরহ, আনন্দ-বেদনার কথা। একদিকে রোসাঙ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় শাহ গরীবুল্লাহ, আলাওল, দৌলতকাজী গড়ে তোলেন বাংলা কাব্যে নতুন ধারা, অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের লোককবিরা রচনা করেন মানবিক লোকগাথা মহুয়া, মলুয়া, কাজলরেখা।

আবার অবহেলা অনাদর

দীর্ঘ পাঁচ শত বছরের মুসলিম শাসনের অবসান হয় ইংরেজ বেনিয়াদের চক্রান্তের সঙ্গে এ দেশের কিছু দালার, উমেদার, পরজীবীর স্বার্থপরতা যুক্ত হবার ফলে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় চলে আসে ইংরেজ শাসকেরা, রাজভাষা হয় ইংরেজি। বাংলা ভাষা হয় আবারো অবহেলার স্বীকার। পরগাছা সেই সুবিধাবাদী দালালেরা এবার ইংরেজ শাসকের অনুগ্রহ লাভের আশায় ইংরেজি শিখে মোসাহেবি শুরু করে, আর ঘৃণা ছুঁড়ে দেয় বাংলা ভাষার প্রতি। এই শ্রেণীর মানুষের জন্ম এই দেশে, বাসও করে এই দেশে, কিন্তু স্বপ্ন দেখে অন্যদেশের অন্য ভাষার। তাই তারা স্রেফ ব্যক্তিগত স্বার্থে নির্লজ্জভাবে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। বিদেশী প্রভুদের মনোরঞ্জন করে নিজের স্বার্থ হাসিল করে। বাংলা ভাষাকে সারা জীবন এই দালালদের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়েছে। বাংলা ভাষার জন্মের মধ্যেই আছে দুর্জয় প্রাণশক্তি। টিকে তো থাকবেই। তার এই প্রাণশক্তির উৎস হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষের ভালোবাসা। এ ভাষা তো কখনো রাজশক্তির দয়া বা করুণার উপরে ভরসা করেনি। ইংরেজ আমলেও অবহেলা অনাদর জুটবে, এ আর নতুন কী! বাংলা তবু এগিয়ে চলে অদম্য প্রাণশক্তির জোরে।

বাংলার প্রতি বাঙালির (!) ঘৃণা

আমাদের এই দেশে এক শ্রেণীর মুসলমান আছে যারা নিজেদের খুব সম্ভ্রান্ত, অভিজাত, খানদানি লোক মনে করে। তাদের পূর্বপুরুষেরা পারস্য কিংবা আরব থেকে এসেছিলেন বলে তারা দাবি করে। হতে পারে তা-ই সত্য। কিন্তু তারপর বংশপরম্পরায় এই দেশে জন্মগ্রহণ করে। এ দেশের আলো হাওয়ায় বাস করে, এ দেশের ফল-ফসলে অন্ন গ্রহণ করেও এ দেশের সাধারণ মানুষকে আপন ভাবতে পারেনি, ভেবেছে নিম্নশ্রেণী বা ইতর শ্রেণীর মানুষ ওরা, ওরা বাংলা ভাষায় কথা বলে। কাজেই এই ইতর শ্রেণীর মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে তারা কিছুতেই সমর্থন করবে না। তারা আঁকড়ে ধরে আরবি,

ফারসি অথবা উর্দুকে। ভাবতে অবাক লাগে—ব্রিটিশ আমলে তারাই নাকি মুসলিম জনগণের নেতা ছিল! জনগণকে কিংবা জনগণের মুখের ভাষাকে ভালো না বেসেও তাদের নেতা হওয়া যায় কীভাবে! এমনই এক নেতা ফরিদপুরের নবাব আব্দুল লতিফ ইংরেজ আমলেই মন্তব্য করেন—উঁচু শ্রেণীর বাঙালি মুসলমানেরা লেখাপড়া করবে উর্দুতে। তবে নিম্নশ্রেণীর বাঙালি মুসলমানেরা ইচ্ছে করলে বাংলা পড়তে পারে। ঢাকার নবাবদের এই একই মানসিকতা ছিল, বাংলা ভাষার প্রশ্নে ছিল সীমাহীন বিদ্বেষ।

শুধু মুসলমানই নয়, এই দেশে জন্ম নেয়া বাংলা-বিদ্বেষী একদল হিন্দুও ইংরেজ সরকারের তোষামোদী করে 'রায়বাহাদুর', 'রায়সাহেব' উপাধি জুটিয়ে নেয়। নিজেরা ইংরেজি শিখে দ্রুত বদলে ফেলে নিজেদের ভাগ্য। দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে দূরত্ব রচনা করে নিজেদের আভিজাত্য আঁকড়ে থাকে। ফলে মাতৃভাষা চর্চা অপেক্ষা ইংরেজির জন্যে দালালি করাকেই তারা জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে। হিন্দু মুসলমান দুই দলেরই তথাকথিত উঁচু শ্রেণীর বাঙালি আপন স্বার্থে অন্ধ হয়ে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। বাঙালি হয়েও তারা নিজেদের ভেবেছে অভিজাত বা উঁচুশ্রেণীর বাঙালি। আর সারা দেশের বাঙালি জনসাধারণকে ভেবেছে নিম্নশ্রেণীর মানুষ। বাংলা ওদের ভাষা—ওই গরিব মানুষের, সাধারণ মানুষের নিম্নশ্রেণীর মানুষের। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, বাঙালি হয়েও তারা বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে। মধ্যযুগের কবি আব্দুল হাকিম বোধহয় তাদের সম্পর্কেই বলেছেন 'সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।'

তবুও সৃষ্টি সুখের উল্লাস

উচ্চবিত্তের অভিজাত শ্রেণীর মানুষের অনাদরে-অবজ্ঞায় জন্মবিদ্রোহী বাংলা ভাষার কী যায় আসে। বাংলা তো কখনো পরোয়াই করেনি তাদের আদর-অনাদরের, ধর্মের ভয় দেখিয়েও লাভ হয়নি; সাধারণ মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়েও বুকের মমতায় আগলে রেখেছে তাকে। মনে হয় যেন এই আমলা-দালাল, সুবিধাবাদীদের বাংলা-বিদ্বেষের প্রাবল্য এ দেশের সাধারণ মানুষের অন্তরে মা-মাটি মাতৃভাষার প্রতি মমত্ব ও দায়িত্ববোধ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলার কবি সাহিত্যিক দার্শনিকরাও বাংলা ভাষার গাছের ডালে ফুল ফুটিয়েছেন হরেক রকম। প্রাণের উষ্ণতামাখা সৃষ্টিসম্ভার দিয়েই যেনবা তাঁরা সমুচিত জবাব দিতে চান বাংলাবিদ্বেষের।

এলেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; বাংলা ভাষার কাব্যিক

শরীর কেটে গদ্যের নতুন বিন্যাস দেখালেন। যথাস্থানে যতিচিহ্ন ব্যবহারের দ্বারা গদ্যের গতিময়তা ফুটিয়ে তুললেন। শুরু হলো বাংলা ভাষায় গদ্যচর্চা। গদ্যচর্চার প্রসঙ্গে দুজন বিদেশীর নাম উঠে আসে। একজন উইলিয়াম কেরি, বাংলা ভাষার উন্নতির জন্যে কলেজ গড়েছেন। অন্যজন নাথিয়েল হ্যালহেড, বাংলা ভাষার চর্চাকে সুসংহত করার জন্যে বাংলা ব্যকরণ লিখেছেন।

প্রচলিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের বিপরীতে দাঁড়িয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচনা করেন বাংলা ভাষার প্রথম মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য'। তার হাত ধরেই নাটক আসে প্রহসন আসে, আসে পত্রকাব্য এবং অসাধারণ সনেট।

দীনবন্ধু মিত্র পোস্টমাস্টারির চাকরি নিয়ে নিভৃত পল্লীতে গিয়ে নীলকরদের নিষ্ঠুর অত্যাচার দেখে আর কৃষককূলের বুকফাটা হাহাকার শুনে কলম তুলে নেন নাটক রচনার জন্যে। জীবনধর্মী নাটক 'নীলদর্পণ' লিখে ইংরেজ বেনিয়াদের মুখোশ উন্মোচন করেন।

এরই পাশাপাশি আমরা পেয়েছি মীর মশাররফের 'জমিদার দর্পণ' নাটক। কারবালার শোকগাথার মধ্য থেকে তিনি তুলে নিয়ে এলেন মানবিক উপাখ্যান 'বিষাদ সিন্ধু'। মাতৃভাষা চর্চা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অবিস্মরণীয়। তাঁর মতে, 'মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই, সে মানুষ নহে'। আরো আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের নাম উল্লেখ করা উচিত ছিল। নিজে উচ্চশিক্ষিত হয়েও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা। ভীষণ দুঃখ ভরে তিনি বলেছেন, 'এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে কীর্তিমন্ত পূর্বপুরুষগণের কীর্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতির মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙালি।'

আমাদের এক রবীন্দ্রনাথই তো বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখা পত্রপুষ্পে ভরে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গান, মরমী কবিতা, চিন্তাশীল প্রবন্ধ বাংলা ভাষার প্রকাশ ক্ষমতার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটিয়েছে। বাঙালি কবি হয়েও পৃথিবীর সেরা নোবেল পুরস্কার অর্জনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি জাতিকে এবং বাংলা ভাষাকে সুউচ্চ মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করেছেন।

কাজী নজরুল শেকল ভাঙার গান গেয়ে, বিদ্রোহের মন্ত্রে ঘুমভাঙাতে চেষ্টা করেন পরাধীন বাঙালি জাতির। তাঁর কবিতা বাংলা ভাষায় নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে।

অতুলপ্রসাদ, হেম, নবীন, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত—কেউ কারো চেয়ে কম কিছু নয়। বাংলা ভাষায় তাঁদের অবদন কারো চেয়ে কম কিছু নয়। এর বাইরেও আছে মরমী কবি লালন শাহ, পাগলা কানাই, হাছন রাজাসহ আরো অনেক কবির নিরব এবং নিবিড় সঙ্গীত-সাধনা, যা বাংলা ভাষার প্রাণ

সম্পদের বিশেষ স্ফূরণ ঘটিয়েছে এবং বাংলা ভাষাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান এই সব কবি সাহিত্যিকের গভীর ভালোবাসায় অভিষিক্ত হয়ে বাংলা ভাষা সাহস পেয়েছে সকল বাধা অতিক্রমের শক্তি পেয়েছে বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার। তাই তো বাঙালি প্রাণ খুলে গাইতে পেরেছে—'মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা'।

ভাষা আন্দোলন : পেছনের ইতিকথা

পরিপূর্ণতায় বিকশিত আজকের সুশোভিত সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা এবং এ ভাষায় রচিত সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে সত্যি আমাদের কত না অহংকার! কিন্তু প্রিয় সোনামণি, আমাদের এই জনম-দুখিনী বাংলা ভাষা সেই জন্ম থেকেই কী রকম লড়াই-সংগ্রাম করে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েছে, সে কথা তোমাদের মনে আছে তো? দুশো বছরের ইংরেজ শাসনের ভিত বারবার কাঁপিয়ে দিয়েছে বাংলা মায়ের বিপ্লবী সন্তানেরা তাদের দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড দিয়ে আর বাঙালি কবি সাহিত্যিকেরা তাদের ক্ষুরধার লেখনী দিয়ে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকসহ ডিএল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকসমূহ, জানা অজানা অসংখ্য কবি ও গায়েনের কণ্ঠের স্বদেশী গান, মুকুন্দ দাস-হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রমুখ শিল্পীর গণসঙ্গীত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তীব্র এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এ দেশের (তখন ভারতবর্ষ) রাজনৈতিক নেতারা উপলব্ধি করেন, ইংরেজরা চলে গেলে এ দেশ স্বাধীন হবে ঠিকই, তবে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হবে। ১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্ট বাস্তবেও হলো তাই। তবে এই স্বাধীনতার সুবাদে এতদিনে যথার্থই বাংলা ভেঙে দুভাগ হলো। 'পূর্বভঙ্গ' হলো পাকিস্তানের পূর্ব অংশ, নতুন নাম পূর্বপাকিস্তান। ভারতের পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান। দুই মিলিয়ে স্বাধীন পাকিস্তান। লোকসংখ্যা মোট ৬ কোটির মতো। তার মধ্যে ৪ কোটির বাস পূর্বপাকিস্তানে, তাদের ভাষা বাংলা; ২ কোটি (প্রায়) লোক বাস করে পশ্চিম পাকিস্তানে, তাদের ভাষা পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বেলুচ, উর্দু ইত্যাদি। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের অধিক মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, সেটাই হবে এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা। এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের শাসকেরা সেটাই মানতে চাইল না। ফলে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে প্রায় অকারণেই বিতর্কের সূচনা হয়।

মজার ব্যাপার, এ বিতর্কের সূচনা হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বেশ আগে থেকেই।

১. মুসলিম লীগের প্রথম সারির এক নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান ১৯৪৭ সালের ১৭ মে হায়দ্রাবাদে এক ভাষণে দাবি করেন—'উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হইবে।'[১১]

সেদিন সরাসরি এ নেতার নাম উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ না হলেও বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা এ বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধ লিখে সম্ভাব্য নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সংকট সম্পর্কে তাঁদের সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীন বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। প্রাবন্ধিক আব্দুল হক পালন করেন অগ্রণী ভূমিকা। তিনি ২২ ও ২৯ জুন ১৯৪৭ দৈনিক ইত্তেহাদ-এ লেখেন 'বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব', ৩০ জুন ১৯৪৭ দৈনিক আজাদ-এ লেখেন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা', ২৭ জুলাই ১৯৪৭ পুনরায় ইত্তেহাদ-এ লেখেন 'উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে' এবং ৩ আগস্ট ১৯৪৭ সাপ্তাহিক বেগম-এ লেখেন 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শিরোনামে চারটি প্রবন্ধ। ২৭ জুন ১৯৪৭ দৈনিক মিল্লাত-এর সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা ভাষাই হইবে ইহা বলাই বাহুল্য। মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোনো ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে বরণ করার চাইতে বড় দাসত্ব আর কিছু থাকিতে পারে না।[১২]

২. আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দীন আহমদ ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে অত্যন্ত জোর দিয়ে মন্তব্য করেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।

ছোট্ট বন্ধুরা, আমাদের বাংলা ভাষায় মজার মজার প্রবাদ আছে, জানো তো? যেমন—'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল'। মানে হচ্ছে পাকা কাঁঠাল খেতে গিয়ে গোঁফে আঠা লাগতে পারে ভেবে গাছ থেকে কাঁঠাল পেড়ে আনার আগেই গোঁফে তেল মাখানো। সার কথা হচ্ছে, আগাম প্রস্তুতি। আরো একটি প্রবাদের কথা শোনো : 'গাছে না উঠতেই এক কাঁধি।' মনে কর—তোমাদের বাড়ির ডাবগাছ থেকে ডাব পাড়বার জন্যে একজনকে দায়িত্ব দিলে। কিন্তু সে গাছে না উঠতেই নিজের জন্য এক কাঁধি ডাব দাবি করে বসে। এটাও এক রকম আগাম প্রস্তুতিই বটে! তবে অন্যায্য।

সেই ১৯৪৭ সালে এ দেশের রাজনীতিতেও সেই ঘটনাই ঘটে। স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হবার আগেই আপন স্বার্থে অন্যায্যভাবে নিজের কোলে ঝোল টানার আয়োজন। পাকিস্তান-আন্দোলনের দুজন উর্দুভাষী উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিত্ব অন্যায্যভাবে আগাম দাবি জানিয়ে বসলেন—উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কী আশ্চর্য! আগে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হোক। তারপর পাকিস্তানের

জনগণই ঠিক করুক তাদের রাষ্ট্রভাষা! না, সম্ভাব্য এ রাষ্ট্রের শতকরা ৫৬ জন নাগরিকই পূর্ববঙ্গের বাঙালি, তারা যদি বাংলা ভাষার দাবি জানিয়ে বসে! সেটাই তো ন্যায্য দাবি! কাজেই জনগণের মতামতের তোয়াক্কা করতে গেলে তাদের চলবে না বলে আগেভাগেই অন্যায্য আবদারের ঘোষণা—'উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।'

ড. জিয়াউদ্দীনের অন্যায্য ঘোষণার প্রতিবাদে এগিয়ে এলেন উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ২৭ জুলাই ১৯৪৭ দৈনিক আজাদ-এ 'পাকিস্তানের ভাষা-সমস্যা' নামে সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ এক প্রবন্ধ লিখে তীব্র প্রতিবাদ জানান এই রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক চক্রান্তের। তাঁর যুক্তি খুবই সহজ-সরল এবং অকাট্য। গণতন্ত্রের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন—পাকিস্তানে যে-ভাষার লোক বেশি, মানে যে-ভাষায় বেশি লোক কথা বলে, সে ভাষাই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এ তো সোজা কথা। কিন্তু আপন স্বার্থভাবনায় আচ্ছন্ন মন যাদের জটিল, তারা সোজা কথা মানবে কেন?

পাকিস্তানের লোকসংখ্যা তখন ৬ কোটি ৯০ লক্ষ। ড. শহীদুল্লাহ দেখালেন, পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশের একটি পাঞ্জাবে আছে এক কোটির কাছাকাছি লোকসংখ্যা, যারা পাঞ্জাবি ভাষায় কথা বলে। সিন্ধুতে আছে কয়েক লাখ মানুষ, তারা সিন্ধি ভাষায় কথা বলে। বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও কয়েক লক্ষ লোকের বাস, যারা তাদের নিজ নিজ ভাষাতেই কথা বলে। এরপর থাকল বাঙালিরা, তারা সংখ্যায় চার কোটি (৪ কোটি ৪০ লক্ষ), এরা কথা বলে বাংলায়। সুতরাং বাংলা ভাষারই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবি ছিল অত্যন্ত সঙ্গত। উর্দুতে পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলের লোকই কথা বলত না।[১৩]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর প্রবন্ধে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'বাংলাদেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দি ভাষা গ্রহণ করা হইলে ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে।'[১৪]

তবু কেন উর্দু

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের মনে তো এই প্রশ্ন জাগতেই পারে—পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলের লোকেরই যখন মুখের ভাষা উর্দু ছিল না, তখন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর কথা ওঠে কী করে, কেনই বা ওঠে?

মজার ব্যাপার কি জানো—অবিভক্ত ভারতে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে লড়াইটা

ছিল প্রথমে হিন্দির সঙ্গে উর্দুর। দুর্ভাগ্যক্রমে সে লড়াইয়ের ঢেউ লাগে পাকিস্তানে এবং উর্দুর প্রতিপক্ষ হিন্দির বদলে বাংলা হলো। খুব জটিল মনে হচ্ছে ব্যাপারটা? এসো, বুঝিয়ে বলি।

ভারতের উত্তর প্রদেশ এবং পাশাপাশি অঞ্চলের মানুষের কথা বলার ভাষা উর্দু। সে-সব এলাকার মুসলমান-অমুসলমান সবাই উর্দু বলে। শিক্ষা-রাজনীতি-অর্থনীতি সব কিছুতেই তারা বেশ এগিয়ে। ইংরেজ দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর, অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, এ প্রশ্নে হিন্দির পাশাপাশি উর্দুর নামও উঠে আসে বটে, কিন্তু লড়াইয়ে হিন্দিই এগিয়ে যায়। পিছিয়ে পড়ে উর্দু। এসব অঞ্চলের উর্দুভাষী মুসলমানেরা লড়াইয়ের নতুন ফ্রন্ট খোলে পাকিস্তানে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই উর্দুর পক্ষে অন্যায্য দাবি জানিয়ে রাখে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ওইসব উর্দুভাষী মুসলমান রাজনৈতিক নেতা, কিছু সরকারি কর্মকর্তা আমলা, বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানে উঠে এসে বড় বড় পদে বসে। তারাই পাকিস্তানের হর্তাকর্তা হয়ে ওঠে। উর্দু তাদের মুখের ভাষা। একেবারে অন্যায্যভাবে সেই উর্দুকে তারা ক্ষমতার জোরে চাপিয়ে দিতে চায় পাকিস্তানের ছয় কোটি অ-উর্দুভাষী মানুষের উপরে। এভাবেই, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়া উর্দুভাষী রাজনীতিবিদেরা পাকিস্তানে এসে ইসলামের দোহাই দিয়ে সারা পাকিস্তানে উর্দুর একাধিপত্য চাপিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়। আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে তার প্রেক্ষাপট রচনার ফন্দি আঁটে।

পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা না হয়েও উর্দুভাষা এভাবেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে সৃষ্টি করে অশুভ ঘূর্ণাবর্ত, বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিকে ঠেলে দেয় অন্যায্য এক লড়াইয়ের মাঠে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই মুসলিম লীগে ভাঙন

সাম্প্রদায়িকতার ছুরিতে বাংলা এবং পাঞ্জাব ভাগের পরিণাম মেনে নিয়েই একদিকে যেমন কংগ্রেস-এর নেতৃত্বে ভারত, তেমনি অন্যদিকে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা যখন নিশ্চিতপ্রায়, ততদিনে অনেকের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে—এই মুসলিম লীগের ভেতরে বাঙালি ও বাংলার স্বার্থসংরক্ষণে দায়িত্বশীল প্রভাবশালী কোনো মহল বা নেতার উপস্থিতি কার্যত নেই বললেই চলে। সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচনে শুধুমাত্র পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরাই মুসলিম লীগকে শর্তহীন সমর্থন জানিয়ে পাকিস্তান-আন্দোলনকে বেগবান করে তুলেছে। অথচ মসুলিম লীগের উপর মহলে

বাঙালি নেতৃত্ব হয়েছে উপেক্ষিত অনাদৃত। যে দু-চারজন উপর মহলের নাগাল পেয়েছে, তারা মূলত বাঙালিত্ব বিসর্জন দিয়ে নির্লজ্জ দালালির পুরস্কার হিসেবেই তা পেয়েছে। উপরন্তু মুসলিম লীগের চেহারা ক্রমশ প্রতিক্রিয়াশীল, সামন্তবাদী ও কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠছে এটা উপলব্ধি করে মুসলিম লীগের ভেতরের প্রগতিশীল বাঙালিদের একটি অংশ ১৯৪৭ সালের জুন মাসের শেষ দিকে ওই দল ছেড়ে এসে গণআজাদী লীগ নামে একটি আদর্শভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলেন। কমরুদ্দীন আহমদ ছিলেন এ দলের আহ্বায়ক, তাঁর সঙ্গে যোগ দেন তাজউদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ প্রমুখ। এ দলের মেনিফেস্টোতে বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাদের অবস্থানের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন এভাবে :

১. মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করিতে হইবে।
২. বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে দেশের যথোপযোগী করার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হইবে পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

এলো সাধের পাকিস্তান, স্বাধীন পাকিস্তান

অনেক রক্তপাত আর দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্য দিয়ে অবশেষে ধর্মের ভিত্তিতেই ভারত ভেঙে স্বাধীন হলো পাকিস্তান ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে। বাঙালি মুসলমানের অনেক স্বপ্ন ও সাধের এ দেশ। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে এই আশায় তারা অন্ধ সমর্থন জানিয়েছে পাকিস্তান আন্দোলনে। অথচ বৈষম্য দিয়েই শুরু হলো পাকিস্তানের যাত্রা।

ছোট্ট বন্ধুরা, এখন আমরা যাকে বলি দেশের প্রেসিডেন্ট, তখনকার দিনে তাকে বলা হতো গভর্নর জেনারেল। তা সারা পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মানে প্রেসিডেন্ট হলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। দেশের মানুষ তাঁকে কায়দে আযম বা জাতির জনক বলে অভিহিত করে। আর সারা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন লিয়াকত আলী খান। দুজনেই অবাঙালি। এদিকে পূর্বপাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হলেন খাজা নাজিমউদ্দীন। ঢাকার মানুষ হলেও তিনি ছিলেন উর্দুভাষী।

নতুন রাষ্ট্রের শতকরা ৫৬ ভাগ নাগরিকের বাস পূর্বপাকিস্তানে হওয়া সত্ত্বেও দেশের রাজধানী ঢাকায় হলো না, হলো সিন্ধুপ্রদেশের রাজধানী করাচিতে। এই সিন্ধুতে মাত্র ৭% নাগরিকের বাস। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সবগুলো হেডঅফিস বসে পশ্চিম পাকিস্তানে। এসব দফতরে

চাকরি পায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা। পাকিস্তানের মূল শাসকশ্রেণী গড়ে ওঠে উর্দুভাষী অবাঙালিদের দিয়ে। তারা পশ্চিম পাকিস্তানে বসে পূর্বপাকিস্তানকে শাসন ও শোষণ করতে চায়, পশ্চিম পাকিস্তানকেই উন্নত করে তুলতে চায়। এ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সেদিন বাঙালি নেতারা কোনো প্রতিবাদ করেননি।

কারা এই উর্দুভাষী পাকিস্তানি শাসক

পাকিস্তানের কোনো প্রদেশেরই মূল ভাষা উর্দু নয়, অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বদানকারী সংগঠন মুসলিম লীগে এবং নবগঠিত পাকিস্তান সরকারে উর্দুভাষী নেতাদেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এরাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে গোঁয়ার্তুমি করে সবার উপরে চাপিয়ে দেয় উর্দু। প্রশ্ন জাগে—কারা এই উর্দুভাষী নেতা?

উর্দুভাষী মুসলমানদের মূল আবাস ছিল পশ্চিম ও উত্তর ভারতে। তাদের অনেকেই উচ্চবিত্তের এবং মধ্যবিত্তের শিক্ষিত প্রভাবশালী মানুষ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই তারা মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হয় এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই তারা ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে চলে আসেন পশ্চিম পাকিস্তানে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ থেকে শুরু করে লিয়াকত আলী খান, গজনফর আলী খান প্রমুখ উর্দুভাষী নেতাদের সকলেই ভারত প্রত্যাগত। ভারত থেকে আগত এসব উর্দুভাষীদের অনেকেই ধনী এবং শিক্ষিত হওয়ায় পাকিস্তানে এসেই চাকরি ব্যবসাসহ সব ক্ষেত্রেই দ্রুত প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। রাজনীতিও থাকে তাদেরই নিয়ন্ত্রণে।

এদিকে বিহার ও পূর্বভারত থেকেও বহুসংখ্যক উর্দুভাষী মুসলমান চলে আসে পূর্বপাকিস্তানে। যাদের বলা হয় মোহাজের। পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দুভাষী শাসকদের বাংলা ও বাঙালিবিরোধী সকল কার্যক্রমে সহিংস সমর্থন যুগিয়েছে এরাই।

আরো একদল উগ্র উর্দু সমর্থকের পরিচয় দিয়ে রাখা দরকার। এরা পূর্ববঙ্গ তথা পূর্বপাকিস্তানেরই মানুষ, নিজেদের খানদানি মুসলমান ভাবতেই অভ্যস্ত। পরিবারের ভেতরে উর্দু চর্চার চল আছে; এদের দেহে আরব পারস্যের রক্তধারা আছে বলে প্রবল বিশ্বাস। এরা ঢাকার নবাব, ফরিদপুরের নবাব; এরা খানবাহাদুর, খান সাহেব প্রভৃতি অভিজাত ও উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধি। উর্দুভাষী পাকিস্তানি শাসকদের কাছ থেকে ক্ষমতার সামান্য উচ্ছিষ্ট ভোগ করে এরা এতটাই তুষ্ট হতেন—যে পূর্বপাকিস্তানের শোষণ বঞ্চনার কথা উপযুক্ত জায়গায় তুলে ধরা তো দূরের কথা, সব সময় প্রভুদের কণ্ঠে কণ্ঠ

মিলিয়ে কোরাস গাইতেন। অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতেন পূর্বপাকিস্তানবাসীর স্বার্থ। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ভোট দিয়ে তাদেরই নেতা বানিয়েছিল। তাদের উপরেই অনেক বড় ভরসা করেছিল—পাকিস্তান স্বাধীন হলেই তাদেরও ভাগ্য বদলাবে, আসবে সুখের দিন।

পাকিস্তানে কি অবাঙালিরাই সবকিছু

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানেরা 'হুজুগে বাঙালি'র মতোই মুসলিম লীগ নেতৃত্বের প্রতি সংশয়হীন সমর্থন দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করার পরপরই ঘোর কাটতে শুরু করে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের তো বটেই, পূর্বপাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারেরও ভালো ভালো চাকরিতে, বিশেষত উচ্চপদে অবাঙালি উর্দুভাষীদের প্রাধান্য শুরু থেকেই চোখে পড়ে। বাঙালির জন্যে দু-চারটি কেরানি-পিয়নের চাকরি মাত্র। সামরিক বাহিনীতে অবাঙালিদের প্রায় একচেটিয়া আধিপত্য। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রেও একচেটিয়া কর্তৃত্ব অবাঙালিদের হাতে। দেশ শাসনের চাবিকাঠি তো একেবারে গোড়া থেকেই কব্জা করে রেখেছে তারা। কেন্দ্রীয় সরকার এবং পূর্বপাকিস্তান সরকারের অবাঙালি কর্মকর্তাবৃন্দ বরাবরই পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে উর্দুভাষীদের প্রতি এবং অন্যায্য বৈরিতা দেখিয়েছে বাঙালিদের প্রতি। এর ফলে বাঙালিদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠতে খুব বেশি সময় লাগেনি। এ ধরনের পক্ষপাতিত্ব এবং বৈষম্যমূলক আচরণ বাঙালিদের অনেকেরই চোখ এড়ায়নি, বিশেষত সরকারি কর্মচারী এবং ছাত্রসমাজের।[১৫]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বেশ আগে থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠার পরেও যখন নতুন রাষ্ট্রের শাসকদের কণ্ঠে বারবার একই কথা উচ্চারিত হতে থাকে যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু ছাড়া অন্য কোনো ভাষা-ই হবে না, তখন অনেকের কাছে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন কি বাঙালি সরকারি কর্মচারীরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে—উর্দু না জানার কারণে চাকরি হারাতে হবে না তো! ছাত্র-সমাজ আতঙ্কিত হয়ে ভাবে এই পাকিস্তান তো আমরা চাইনি—যেখানে অবাঙালিরাই হবে সবকিছু!

প্রতিবাদের প্রস্তুতি : প্রথম পর্যায়

১. তমদ্দুন মজলিশ

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র ১৬ দিনের মাথায়

মাতৃভাষা বাংলা রক্ষা এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবিতে ১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ইসলামী স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত সাংস্কৃতিক সংগঠন 'তমুদ্দুন মজলিশ'-এর জন্ম হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে গঠিত এ সংগঠনের সঙ্গে শুরু থেকেই যুক্ত ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট), শামসুল আলম এবং ফজলুল রহমান ভূঁইয়া।[১৬] প্রকৃত পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশকিছু ছাত্রও ছিলেন এ সংগঠনে। ১৫ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা—বাংলা না উর্দু' শিরোনামে একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণার দাবি জানায় এবং পরবর্তীতে এ দাবি আদায়ের লক্ষ্যে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে। আমাদের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ইতিহাসবিদ বদরুদ্দীন উমর এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন :

ভাষা-আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলা ভাষার দাবিতে প্রথম সংগ্রাম পরিষদ তাদের উদ্যোগেই গঠিত হয়।[১৭]

২. পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের নেতৃত্বে সদ্য স্বাধীন পাকিস্তান যে অতি দ্রুত সাম্প্রদায়িকতার পঙ্কে তলিয়ে যাচ্ছে এবং রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে উর্দুভাষার পক্ষে মারাত্মক কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠছে, এ অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশে ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর, ঢাকায় অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে এক মহা যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মুসলিম লীগ সরকার গুণ্ডামি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে সে আয়োজন পণ্ড করার চেষ্টা চালিয়েও সফল হয়নি। এ সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত 'আমরা গড়িব স্বাধীন সুখী গণতান্ত্রিক পাকিস্তান' নামের পুস্তিকায় রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করা হয়।

৩. মোহাজের পুনর্বাসনে বৈষম্য

১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের কারণে ভারত থেকে যে সব মানুষ 'রিফ্যুজি হয়ে স্থায়ীভাবে পাকিস্তানে চলে আসে, পাকিস্তান সরকার তাদের 'মোহাজের' বলে অভিহিত করে। মোহাজেরও ছিল দুই রকম : ১. পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আগত বাঙালি মোহাজের এবং ২. ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ

থেকে পূর্বপাকিস্তানে আগত অবাঙালি মোহাজের। এই মোহাজের সমস্যা পশ্চিম পাকিস্তানে ততটা ছিল না, যতটা ছিল পূর্বপাকিস্তানে। সরকারি উদ্যোগে 'পূর্ববঙ্গে অবাঙালি মোহাজেরদের পুনবার্সনের জন্যে যতটা চেষ্টা চলে, তার সামান্যই দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বাঙালি মোহাজের বা চাকরিজীবীদের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে।'[১৯]

৪. সরকারি কর্মচারীদের অসন্তোষ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এক মাস না পেরোতেই সরকারের নানাবিধ বৈষম্যমূলক আচরণ ও কার্যকলাপের কারণে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় (৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে সরকারি সচিবালয়ে সবকটি নয়া উচ্চপদে অবাঙালিদের নিয়োগ শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ঐ পত্রিকায় আরো লেখা হয় যে খাওয়া দাওয়া বাসস্থান ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে পূর্ববঙ্গের সরকারি কর্মচারীদের অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে চলেছে।[২০]

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা কি বুঝতে পারছ—পাকিস্তান নামের ধর্মভিত্তিক দেশটিকে ঘিরে বাঙালি মুসলমানদের অন্তরে যে স্বপ্ন-সাধ ছিল, আশা-ভরসা ছিল, এভাবেই একটু একটু করে তা ভেঙে পড়তে থাকে। পাকিস্তানের নতুন সরকারের দিক থেকে আঘাত আসতে থাকে একের পর এক, নানা প্রসঙ্গে। তবে সবচেয়ে বড় এবং জোরালো আঘাতটি আসে বাংলা ভাষাকে ঘিরে। পাকিস্তানের অবাঙালি কর্তাব্যক্তিরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের নিরঙ্কুশ সমর্থন নেবে, পূর্ববঙ্গকে ১২০০ মাইল দূর থেকে পূর্বপাকিস্তান করে নেবে, সেই পূর্বপাকিস্তানের ফল-ফসল বৈদেশিক মুদ্রা নেবে; কেবল পূর্বপাকিস্তানের জনগণের মুখের ভাষা বাংলাকে স্বীকৃতি দেবে না, যত আপত্তি, ছলচাতুরি এইখানে এই প্রসঙ্গে। ফলে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন তথা বাংলা ভাষার দাবি নিয়ে ক্রমশ উত্তাপ জমা হতে থাকে। সরকার উর্দুর পক্ষে অনড় অবস্থান নিয়ে বক্তৃতা বিবৃতি দিতেই থাকে। বাঙালিরাও মরিয়া হয়ে নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দাবি জানাতেই থাকে। সৃষ্টি হয় বিতর্ক ও সংঘাতের পথ। এদিকে সরকারি মদদে পূর্ববঙ্গের অবাঙালি মোহাজেররা বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে উর্দুর পক্ষে আস্ফালন করতে থাকে। চোখের সামনে এতসব নৈরাজ্য দেখে বাঙালি মুখ বুঁজে থাকতে পারে? তোমরাই বলো, বাংলা মায়ের এই অপমান মেনে নেয়া যায়?

৫. পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সংসদের দাবি

১৯৪৭ সালের ৭ নভেম্বর পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপিত হয়। ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি দ্বিধাহীন সমর্থন থাকলেও সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেইন এবং সৈয়দ আলী আহসানের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই সংগঠন মনে করে বাংলার মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা, উর্দু নয়।

৬. প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকপত্র প্রদান

৪ নভেম্বর ১৯৪৭ তারিখে পূর্বপাকিস্তান সাংবাদিক সংঘের পক্ষ থেকে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট বাংলাকে পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করার দাবিতে স্মারকপত্র দেয়া হয়। এই স্মারকপত্রে কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী, সরকারি ও বেসরকারি অফিসের বিভিন্ন ধরনের উচ্চপদস্থ পেশাজীবী অর্থাৎ ঢাকা শহরের বিশিষ্ট নাগরিক প্রায় সকলেই সাক্ষর করেছিলেন।[২১] স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল :

> বাংলা ভাষা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী ভাষা এবং বিশ্বের প্রধান ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের প্রায় ৮ কোটি লোক বাংলা ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ইহার বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়া ইহাকে বর্তমান উন্নতস্তরে উন্নীত করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বপাকিস্তানের গভর্নমেন্টদ্বয় উভয়েই যদি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উহার ভবিষ্যত আরো উজ্জ্বলতর হইবে।

১৯৪৭ সালের ১৭ নভেম্বর পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাভাষাকে ঘোষণা দেয়ার জন্যে শত শত নাগরিকের স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকপত্র পেশ করা হয় পূর্বপাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের কাছে। ফলাফল যা-ই হোক না কেন, নতুন দেশে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রশ্নে এই স্মারকপত্র বা প্রতিবাদলিপির গুরুত্ব মোটেই কম কিছু ছিল না।

থলের বেড়াল বেরিয়ে পড়ে নভেম্বরেই

১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্টে পাকিস্তানের জন্মলাভের আগে ও পরে এই নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে যখন দেশে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে, তখন অর্থাৎ স্বাধীনতার চার মাসের মাথায় নভেম্বরে উর্দুভাষায় ছাপা খাম, পোস্টকার্ড,

ডাকটিকেট, মনিঅর্ডার ফরম এবং টাকা চলে আসে জনগণের হাতে। পূর্বপাকিস্তানের বাঙালি জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় স্মারকসমূহে উর্দুভাষার এই একচ্ছত্র উপস্থিতি দেখে আরো উত্তেজিত এবং আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। ছাত্রসমাজ হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। তারা স্পষ্ট বুঝতে পারে—পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকেরা এভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির উপরে উর্দুকে চাপিয়ে দেবে। আর কোনো রাখা-ঢাকা নয়, থলের বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে; এখন উর্দুর এই একাধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ফলে 'ঢাকার ছাত্রজনতা সভা, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং উর্দুর পাশে বাংলার দাবি জানায়।[২২]

আচ্ছা, তোমরাই বলো তো সোনামণি, উর্দুতে ছাপা খাম পোস্টকার্ড মনিঅর্ডার ফরম, রেলের টিকেট, স্টিমারের টিকেট সাধারণ বাঙালি কিভাবে ব্যবহার করবে? টাকা পয়সাইবা চিনবে কী করে?

প্রথম শিক্ষা সম্মেলনে উপেক্ষিত বাংলা ভাষা : পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রাজধানী শহর করাচিতে। সম্মেলন শুরু হয় ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর। নতুন রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্মেলনে ঢাকা থেকে যারা যোগ দেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং পূর্বপাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহার। দুজনেই বাঙালি, তবে ফজলুর রহমানের বাড়িতে উর্দুভাষার চল ছিল। তারা এই বাংলারই মানুষ। বাংলার সব রকম স্বার্থ দেখার কথা এঁদেরই। কিন্তু এঁরা কেউই উক্ত সম্মেলনে পূর্ববাংলার পক্ষে কোনো কথাই বলেননি, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি সেখানে বিবেচিতই হয়নি। শিক্ষা সম্মেলন শেষ হলে ৬ ডিসেম্বরের 'মর্নিং নিউজ'—এ এতদসংক্রান্ত যে সংবাদ ছাপা হয়, তাতে দেখা যায়—১. 'শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।'

এ কথার মানে কী তোমরা বুঝেছ সোনামণি? স্কুল-পড়ুয়া সব ছাত্রকে উর্দু ভাষা শিখতে বাধ্য করা হবে। বোঝার উপরে শাকের আটিও কিন্তু ভারি হয় জানো তো? ঐ সময়ে স্কুলের ছাত্রদের বাংলা ইংরেজি আরবি শিখতেই হতো। এবার যুক্ত হবে উর্দুও। রাষ্ট্রভাষা বাংলা নিয়ে বাঙালি জনগণের অর্থাৎ পাকিস্তানের ৫৬ ভাগ নাগরিকের যে আবেগ ও প্রত্যাশা, তার কোনো মূল্যায়নই হলো না শিক্ষা সম্মেলনে। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান এই

পূর্ববঙ্গের মানুষ হয়েও পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দুভাষী নেতাদের খুশি করে নিজের মন্ত্রীত্ব ঠিক রাখার জন্য উর্দুর পক্ষে সিদ্ধান্ত নেন।

৬ ডিসেম্বর খবরের কাগজে এসব সংবাদ পড়ে পূর্বপাকিস্তানে যা প্রতিক্রিয়া হওয়ার তাই হলো। সারা ঢাকা শহরের ছাত্রসমাজ গর্জে ওঠে প্রতিবাদে। এদিন বেলা দুটোর দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের এক বিরাট প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়, তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে। শুধু ছাত্র নয়, অনেক শিক্ষকও সে সভায় যোগ দেন। এ সভায় বক্তৃতা করেন মুনীর চৌধুরী, আব্দুর রহমান, কল্যাণ দাশগুপ্ত, একেএম আহসান, এস আহমদ প্রমুখ। বক্তারা সকলেই শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, এটা হচ্ছে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের বাঙালিত্ব খর্ব করার এবং সাংস্কৃতিক দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার সুগভীর চক্রান্ত। এই ঘৃণ্য চক্রান্ত রুখতে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফরিদ আহমদ উক্ত সভায় ৪ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রতিবাদী এই ছাত্র সমাবেশ এক ঘণ্টা চলার পর নেমে আসে রাস্তায়। শুরু হয় বিক্ষোভ-মিছিল। গন্তব্য সেক্রেটারিয়েট। মিছিলের শ্লোগান 'উর্দুর জুলুম চলবে না', 'পাঞ্জাবিরাজ বরবাদ', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি। ছাত্রদের এই বিক্ষোভ এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে ভয়ে সরকারের মন্ত্রীরাও এসে ছাত্রদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। মিছিল সেক্রেটারিয়েটের (সচিবালয়ের) সামনে পৌঁছলে পূর্ববঙ্গের কৃষিমন্ত্রী মহাম্মদ আফজাল এসে ছাত্রদের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন, বাংলা ভাষার দাবি সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং বলেন, করাচিতে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তা অন্যায় এবং ভুল। আমরা তা মানি না।

এরপর ছাত্রদের এ বিক্ষোভ মিছিল প্রাদেশিক মন্ত্রী নূরুল আমীনের বাস ভবনে উপস্থিত হলে মন্ত্রী তাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি বাংলার দাবি প্রতিষ্ঠার জন্যে সরকারের উচ্চমহলে জোর দাবি জানাবেন। দাবি বাস্তবায়ন না হলে তিনি মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করবেন। নূরুল আমীনের বাসভবন থেকে মিছিলটি যায় হামিদুল হক চৌধুরীর বাসভবনে। এই মন্ত্রীও বাংলার দাবি সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন। কেউ কেউ বলেন, সেদিন মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীর সঙ্গে ছাত্রদের তীব্র বাদানুবাদ হয়।

বিক্ষোভকারী ছাত্ররা এবার হাজির হয় পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী (প্রধানমন্ত্রী) খাজা নাজিমউদ্দীনের বাসভবনে (বাংলা একাডেমীর বর্ধমান হাউস)। তিনি অসুস্থ, পরে কথা বলতে চান। কিন্তু ছাত্ররা অনড়। অবশেষে ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তর্কবিতর্কের পর একটি কাগজে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে তিনি চেষ্টা করবেন বলে লিখিত দেন। ছাত্ররা সবশেষে মর্নিং নিউজের অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ জানায়।

ছড়িয়ে গেল ভাষার লড়াই

করাচিতে শিক্ষা সম্মেলনের সংবাদ ৬ ডিসেম্বরের খবরের কাগজে দেখার পর ঐদিনই তাৎক্ষণিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঢাকার ছাত্রসমাজ যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, পূর্ববঙ্গের মন্ত্রীদের যে সমর্থন আদায় করে, বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে তা প্রথম মশাল জ্বেলে দেয়। এ মশালের আগুন ধীরে ধীরে প্রতিদিনই ছড়িয়ে পড়ে।

৬ ডিসেম্বরের পর ৭ ডিসেম্বরও (১৯৪৭) ঢাকায় রেল কর্মচারীদের এক সভাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় চরম উত্তেজনা, হট্টগোল ও সংঘর্ষ। এর নেপথ্যেও ছিল সরকারি উস্কানি। 'সভায় উপস্থিত বাঙালি ও অ-বাঙালিদের মধ্যে মারামারি লেগে যায় এবং অ-বাঙালি (তথা মুসলমান) বনাম বাঙালি (তথা হিন্দু) অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষা উর্দু বনাম বাংলা ইত্যাদি জটিল ও নাজুক প্রসঙ্গ টেনে এনে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা চালিয়ে শান্তিপূর্ণ সভাকে দক্ষযজ্ঞে পরিণত করা হয়।'[২৩]

ভাষা আন্দোলনের নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদ বদরুদ্দীন উমর এদিনের ঘটনা সম্পর্কে লেখেন :

> এই সভা সম্পর্কে সেদিন ঢাকা শহরের লোকদের বিশেষত কুট্টিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় যে সভাটি আসলে ছিল হিন্দুদের সাথে মিলে ফজলুল হকের নেতৃত্বে একটি পাকিস্তানবিরোধী চক্রান্ত। তাছাড়া বাংলার মতো একটি হিন্দুভাষাকে উর্দুর পরিবর্তে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রের কথাও উল্লেখ করা হয়। এই সব প্রচারণার ফলে সেদিনই সিরাজুদ্দৌলা পার্কে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হওয়াকালে কুট্টিরা সেখানে উপস্থিত হয়ে চেয়ারে অগ্নি সংযোগ ও অন্যান্য হাঙ্গামা সৃষ্টি করে এবং সাধারণভাবে ছাত্রদের উপরে তারা ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষক বদরুদ্দীন উমর আরো জানান : এ ঘটনার কয়েকদিন পর ১২ ডিসেম্বর কিছুসংখ্যক কুট্টি ও বিহারী বাস ও ট্রাকে চড়ে পলাশী ব্যারাক এবং আহসানউল্লাহ্ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উপস্থিত হয় এবং সরকারি কর্মচারী ও ছাত্রদেরকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে। কয়েক রাউন্ড গুলিও এ সময় তারা বর্ষণ করে। এই সংবাদ আগুনের মতো সারা ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্র এবং ঢাকার জনসাধারণও এই গুণ্ডামি বন্ধ করার জন্যে ইঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেলে সমবেত হন। শুধু তাই নয়, তাঁরা এর প্রতিকার দাবি করার জন্যে একটি মিছিল করে সেক্রেটারিয়েটের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এই মিছিলটি শুধু ছাত্র মিছিল ছিল না এতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন অংশের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকরাও বিপুল সংখ্যায় যোগদান করেছিলেন। বস্তুত বাংলা ভাষার দাবিতে এ জাতীয় মিছিল এই সর্বপ্রথম।

এভাবেই বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে সচেতন ছাত্র সমাজের মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা প্রতিবাদ কর্মসূচি শুধুমাত্র কিছু আন্দোলন-সংগ্রামের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমিত না থেকে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ব্যাপ্তি লাভ করে। অবশ্য এ কৃতিত্বও ছাত্রসমাজেরই, রাজনীতিবিদদের নয়।

এলো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্ট যে-রাষ্ট্রের জন্ম, ডিসেম্বর পর্যন্ত আসতেই যেন বা হাঁপিয়ে ওঠে সেই রাষ্ট্র। জন্মের পর থেকে প্রতিটি পদক্ষেপ যার পক্ষপাতদুষ্ট, তার তো অসুস্থ হবারই কথা। আর এই অবজ্ঞা ও পক্ষপাতিত্বের শিকার যারা, তারা কতদিন চুপচাপ মুখ বুঁজে সব অবিচার সইবে? রাজনীতিবিদদের মন্ত্রীত্বের মসনদ টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সব কিছু দেখেও না দেখার ভান করা দরকার হতে পারে, জনগণের এমন দাসত্বের কোনো দায় নেই। আর পূর্ববঙ্গের ছাত্রসমাজ তো অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়াতেই জানে না। তাই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলা ভাষার প্রতি পাকিস্তান সরকারের সীমাহীন উপেক্ষা এবং উর্দুভাষা চাপিয়ে দেয়ার রাষ্ট্রীয় চক্রান্ত রুখতে ছাত্রসমাজই প্রথমে এগিয়ে আসে। পরে যুক্ত হয় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবি বাঙালির প্রাণের দাবি হয়ে ওঠে। অথচ সেই দাবি রুখতে পাকিস্তান

সরকার মদদ দিয়ে অ-বাঙালি মোহাজেরদের উত্তেজিত করে তোলে এবং তাদের ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পর্যন্ত বাধাতে উদ্যত হয়। বলতে গেলে ১৯৪৭ সালের শেষ দিনগুলো কাটে নানা রকম অস্থিরতা ও উত্তেজনায়। এরই মাঝে জন্ম নেয় প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ।' এ দেশের অন্যতম ভাষাসৈনিক গাজিউল হক এই সংগ্রাম পরিষদের জন্মকাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

> ১৯৪৭ সালে ডিসেম্বরের শেষ দিকে পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে রশিদ বিল্ডিং নামে যে বিল্ডিং ছিল সেখানে একটি কক্ষে (তমদ্দুন মজলিশের অফিসে) একটি সভা হয়। প্রতিনিধি-স্থানীয় ছাত্র, প্রফেসর এবং বুদ্ধিজীবীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে মুসিলম ছাত্রলীগের কিছু নেতৃস্থানীয় ছাত্র, গণতান্ত্রিক যুবলীগের কর্মী এবং তমদ্দুন মজলিসের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই সর্বপ্রথম সংগ্রাম পরিষদ। ... পরিষদের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন অধ্যাপক নূরুল হক ভুঁইয়া। তিনি তমদ্দুন মজলিসের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এ কমিটিতে অধ্যাপক আবুল কালাম, জনাব তোয়াহা, জনাব নঈমুদ্দীন আহমদ, জনাব শওকত, জনাব ফরিদ আহমদ এবং সম্ভবত জনাব আখলাকুর রহমান, জনাব আব্দুল মতিন খান চৌধুরী ও আজিজ আহমদ ছিলেন।[২৪]

সদ্যগঠিত 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর অস্থায়ী কার্যালয় করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট অফিসের পশ্চিম দিকের বারান্দায়। সেদিনের সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যুক্ত এবং পরবর্তীকালের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ তোয়াহা এ প্রসঙ্গে লিখেছেন : '... এইভাবেই ভাষা-সংগ্রাম পরিষদের অফিসটা ফজলুল হক হলে এসেছিল। ভাষা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র এখান থেকেই জন্মগ্রহণ করে।'

অবশ্য 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' (গঠন : ১১ মার্চ ১৯৫০) এবং 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' (গঠন : ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২) প্রসঙ্গে যথাস্থানে আলোচনা করা হলে আজকের দিনের কিশোর পাঠকদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠবে—সদ্য স্বাধীন একটি দেশে ভাষার লড়াই কীভাবে জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং একটি জাতির উন্মেষ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

১৯৪৮ : নতুন বছরে সঙ্কটের নতুন মাত্রা

মাত্র সাড়ে চার মাস দেশ শাসনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের প্রথম সরকার পার করে তার প্রথম বছর। মাত্র এই কদিনের মধ্যে দেশবাসীর (বিশেষত পূর্বপাকিস্তানের মানুষের) কাছে উন্মোচিত হয়ে পড়ে শাসক শ্রেণীর ভণ্ডামির মুখোশ। মুখে 'ভাই-ভাই' বললেও পূর্বপাকিস্তানের (তখন পূর্ববঙ্গ) প্রতি সকল ক্ষেত্রেই যে তারা বৈষম্যমূলক আচরণ করবে এবং সে-বৈষম্যের প্রতিবাদ করলেই দমন-পীড়ন নির্যাতনের স্টীমরোলার চালাবে, এটা স্পষ্ট হয়ে পড়ে। চোখ বন্ধ করে সমর্থন জানিয়ে মুসলিম লীগকে ক্ষমতায় আনতে সব চেয়ে বড় সহযোগিতা করেছিল যে পূর্বপাকিস্তানবাসী, মাত্র এক বছর পূর্ণ না হতেই তাদের আস্থার জমিনে ফাটল ধরে, দিবাস্বপ্ন ভেঙে যায়; সচেতন মানুষ, প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ, সাহসী ছাত্রসমাজ সত্যিকারের মুক্তির পথ খুঁজতে শুরু করে।

শুরুটা হয় রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গ নিয়ে। রাষ্ট্রের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ যে-ভাষায় কথা বলেন, সেই বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে উদ্ভট উর্দুকে জোর করে সবার উপরে চাপানোর অপচেষ্টার প্রতিবাদ করে বাঙালি। গড়ে তোলে আন্দোলন। শুরু হয় সরকারি হামলা ও নির্যাতন। ফল হয় উল্টো। ১. রাষ্ট্রভাষা-সমস্যা সম্পর্কে অসচেতন মানুষেরও সচেতনতা বৃদ্ধি ঘটে; ২. যাঁরা এ সম্পর্কে উদাসীনতা দেখিয়েছেন এতদিন তাঁরাও সক্রিয় হয়ে ওঠেন; ৩. যারা এ প্রসঙ্গে নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছিলেন, আঘাতটা টের পাবার পর তাঁরা মাতৃভাষা বাংলার প্রতি প্রবল মমত্ব অনুভব করতে লাগলেন। বিশেষ করে নতুন টাকার নোট, খাম পোস্টকার্ড, মনিঅর্ডার ফর্ম এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষায় বাংলা ভাষার অনুপস্থিতি গুটিকতক দালাল ছাড়া সকল বাঙালির টনক নড়িয়ে দেয় এবং তারা বেশ বুঝতে পারে সরকারের এই বাংলা বিরোধী নীতির অন্যতম প্রধান মুখপাত্র কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী উর্দুপ্রেমিক বঙ্গসন্তান ফজলুর রহমান। বিভিন্ন সভাসমিতি বক্তৃতা বিবৃতিতে তাঁর যে কী আস্ফালন! আরবি হরফে বাংলা লেখার উদ্ভট প্রস্তাব! আরো কত চক্রান্ত!

সরকারের শোষণ-বৈষম্য, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র রুখতে হলে প্রয়োজন শক্তিশালী, সৎ, নির্ভীক ছাত্র সংগঠন। এ বিবেচনা এবং দায়িত্ববোধ থেকে এগিয়ে এলেন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে আগত তরুণ সাহসী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। নতুন বছরের (১৯৪৮) ৪ জানুয়ারি তাঁরই উদ্যোগে ও নেতৃত্বে গড়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। সঙ্গে ছিলেন নইমউদ্দিন আহমদ, অলি আহাদ, আব্দুর রহমান চৌধুরী, তোয়াহা, আজিজ আহমদ,

আব্দুল মতিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। শুধু ভাষা আন্দোলনেই নয়, পরবর্তীতে এই সংগঠনই ছাত্রলীগ নামে বাংলা ও বাঙালির দাবি আদায়ের প্রধান ছাত্র সংগঠনে পরিণত হয়।[২৫] মুসলিম লীগ সরকারের বাংলা ও বাঙালিবিরোধী নীতি ও কার্যক্রম প্রতিরোধের উদ্দেশেই জন্ম নেয় এ সংগঠন। বাংলা সংস্কৃতিকে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি এবং বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়ানী ভাষা বলে মুসলিম লীগ যে অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করে, তার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ার কৌশল নির্ধারণের জন্য জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ঢাকার মোগলটুলীতে ৭ দিনের এক ওয়ার্কার্স ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্যাম্পের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জানুয়ারির ৮ তারিখে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানাতে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। কিন্তু এ আলোচনার ফলাফল মোটেই স্বস্তিকর কিছুই হয়নি।

এরপরও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে তাদের অবস্থানের কথা ব্যাখ্যা করেন এবং পাকিস্তান সরকারের রাষ্ট্রভাষা নীতি পরিবর্তনের আহ্বান জানান।

চোরা না মানে ধর্মের কাহিনী

ঢাকা জেলার দোহারে তাঁর জন্ম হলে কী হবে, পাকিস্তান-প্রেমে মন মজিয়েছেন ষোলো আনা, পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীত্ব; তাঁর কাছে আবেদন নিবেদন মানেই অরণ্যে রোদন। ফেব্রুয়ারি ২ তারিখে (১৯৪৮) এই শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কে এক জনসমাবেশে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সেখানে রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কৌশলে এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। শুধু বলেন—বিষয়টি গণপরিষদের বিবেচ্য, তাঁর পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়।

'গণপরিষদ' হচ্ছে—এখনকার জাতীয় সংসদ বা পার্লামেন্ট। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। মন্ত্রী জানাচ্ছেন—রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক সিদ্ধান্ত হবে গণপরিষদে। তা সেই সিদ্ধান্ত হওয়ার আগেই পাকিস্তানের কর্তারা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা দিয়ে চলেছেন কীভাবে? না সে প্রশ্নের উত্তর নেই। বাংলার দাবি তুলতেই বাঙালকে হাইকোর্ট দেখান ঠিকই। অর্থাৎ গণপরিষদের দোহাই পাড়েন।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের স্মারকলিপি

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেই অগ্রসর হতে চায়। পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন যেহেতু ২৩ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে যাচ্ছে, তাই গণপরিষদ সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এক স্মারকলিপি প্রস্তুত করে পূর্বপাকিস্তানের হাজার হাজার মানুষের স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে সরকারের কাছে জমা দেয়। তাদের প্রত্যাশা—গণপরিষদের আসন্ন অধিবেশনের আগেই সরকার এবং গণপরিষদ সদস্যগণ যেন পূর্ববঙ্গের সার্বিক পরিবেশ এবং বাঙালি জনসাধারণের মনোভাব যথাযথভাবে বুঝতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন; সেই জন্যেই যথাযথভাবে স্মারকলিপি প্রদান করা।

গণপরিষদের অধিবেশন : বাঙালির স্বপ্নভঙ্গ

পাকিস্তান গণপরিষদের বহু প্রত্যাশিত প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ সাল। গণপরিষদ তো গণমানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সভাকক্ষ। সেখানে বাঙালি-অবাঙালি সব নেতাই কথা বলবেন। কিন্তু কথা বলতে হবে উর্দু অথবা ইংরেজি ভাষায়। এটাই নিয়ম। বাংলা ভাষায় কথা বলার নিয়ম নেই। যে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ বাংলায় কথা বলে, সে-দেশের পার্লামেন্টে বাংলা ভাষায় কথা-ই বলা যাবে না! অদ্ভুত নিয়ম বটে! এ নিয়ম কি পাল্টানো যায় না কিছুতেই? গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী তো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা বাংলা ভাষারই অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা! তা অগ্রাধিকার না হোক, একটু অধিকারও থাকবে না?

কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সেই দাবিটাই জানান—উর্দু, ইংরেজির পরেই না হয় বাংলার অধিকার দেয়া হোক। আমরা বাংলা ভাষাতেই বক্তৃতা করতে চাই, কথা বলতে চাই এই গণপরিষদে।

না, অনুমতি মেলে না। বরং এ প্রস্তাব শুনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান তো রেগেমেগে আগুন। তিনি বলেন, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাকি এমন প্রস্তাব তোলাটাই ঠিক হয়নি। প্রথম দিন অর্থাৎ ২৩ ফেব্রুয়ারি নয়, ২৫ ফেব্রুয়ারি বেসরকারি দিবসে এসব নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

একবার নয়, বাংলা ভাষার পক্ষে তিনবার সংশোধনী প্রস্তাব আনেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ২৫ ফেব্রুয়ারিতে ধীরেন্দ্রনাথকে সমর্থন করেন তাঁর দলেরই

অন্য সদস্য রাজকুমার চক্রবর্তী, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা ছিলেন কংগ্রেস নামের একটি দলের সদস্য। তাঁরা বলেন—আমরা তো বাংলাকে কারো উপরে চাপিয়ে দেয়ার কথা বলিনি। আমাদের দাবি উর্দু, ইংরেজির পাশে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাও থাকুক। দেশের অর্ধেকেরও বেশি নাগরিক বাংলায় কথা বলে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিলে তারা সবাই স্বস্তি পাবে, আনন্দ পাবে, আস্থা পাবে।

কে শোনে কার কথা! সরকারি দল মুসলিম লীগের যেসব মুসলিম সদস্য পূর্বপাকিস্তান থেকে এসে যোগ দিয়েছিলেন অধিবেশনে, তাঁরা বাংলা ভাষার পক্ষে একটি কথাও বললেন না। পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী মানে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন এবং গণপরিষদের সহসভাপতি তমিজউদ্দীন খান উভয়েই তীব্রভাবে বাংলা ভাষার বিরোধিতা করলেন। কেন্দ্রীয় আরেক মন্ত্রী গজনফর আলী খান বলেন—পাকিস্তানের একটিমাত্র সাধারণ ভাষা থাকবে এবং সে ভাষা হচ্ছে উর্দু। ... উর্দু কোনো প্রদেশের ভাষা নয়, তা হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতির ভাষা। বঙ্গসন্তান খাজা নাজিমউদ্দিন তো চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দিলেন—'পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীরই এই মনোভাব যে, একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে'। অধিবেশনে উপস্থিত বাঙালি মুসলিম সদস্যের মধ্যে কেউ কোনো প্রতিবাদ করেননি এই মনগড়া উক্তির। বরং যখন এই প্রসঙ্গে ভোট হয়, তখনো তাঁরা নির্বিকারভাবে বাংলার বিরুদ্ধেই ভোট দেন।

এসব খবর ঢাকায় এসে পৌঁছুনো মাত্র ছাত্রসমাজ উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। তারা রাগে ক্ষোভে ঘোষণাই দিয়ে বসে—বাংলা মায়ের সন্তান হয়েও যেসব সদস্য বাংলা ভাষার পক্ষে কথা বলেননি, পূর্ববঙ্গে ফিরলেই তাদের ধোলাই হবে। কিন্তু সবকিছুর আগে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সর্বাত্মক হরতাল।

স্বতঃস্ফূর্ত এবং সর্বাত্মক হরতাল পালিত হলো ঢাকা শহরে। ওদিকে উত্তরাঞ্চলীয় শহর রাজশাহীতে স্কুল কলেজে ছাত্রধর্মঘট পালিত হয় আগের দিন। ২৫ ফেব্রুয়ারি করাচির গণপরিষদে যখন রাষ্ট্রভাষা নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলে, তখন রাজশাহীর ভুবনমোহন পার্কে অনুষ্ঠিত ছাত্রসমাবেশ থেকে ৪ দফা দাবি তুলে ধরে মাতৃভাষার প্রশ্নে পূর্ববঙ্গবাসীর মানসিকতার কথা জানিয়ে দেয়া হয়। ৪ দফা প্রস্তাবে বলা হয় : ১. বাংলা ভাষাকে পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে; ২. নৌ-বিভাগে পূর্ব বাংলার যুবকদের বাংলা ভাষায় পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দিতে হবে; ৩. বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে; ৪. দেশের ডাকটিকেট ও মুদ্রায় বাংলাকেও স্থান দিতে হবে।

গণপরিষদের সিদ্ধান্ত : পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া

করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবি অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গালাগালি দিয়ে বলেন—যাদের মাথায় বাংলার ভূত চেপেছে তারা পাকিস্তানের শত্রু, বিচ্ছিন্নতাবাদী। সেখানে উপস্থিত পূর্বপাকিস্তানের মুসলিম সদস্যের কেউই কোনো প্রতিবাদ করেনি এসব বক্তব্যের, কোনো দায়িত্ব পালন করেনি বাংলা ভাষার পক্ষে। গণপরিষদের অধিবেশনের এসব সংবাদ পূর্ববঙ্গে এসে পৌঁছানোর পর বিভিন্ন স্থানে কীরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ 'অমর একুশে' গ্রন্থে তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন। সে বিবরণে বলা হয় :

> গণপরিষদের ঘটনা জেনে যাওয়ার পর নানা জায়গায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীর নওগাঁয় বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হলো। সারা মহকুমায় আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশে একটি সর্বদলীয় কমিটি প্রস্তুত করা হলো। একই দিনে বরিশালে জেলা মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে মুসলিম ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল; 'সভার পর বিরাট শোভাযাত্রা বাংলাভাষার পক্ষে ধ্বনি দিতে দিতে শহর প্রদক্ষিণ করে।' এতদ্ব্যতীত বিএম কলেজেও ছাত্রদের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে খুলনা, দিনাজপুর, পাবনা, মুন্সীগঞ্জ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। খুলনার দৌলতপুরে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বাংলাকে পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্দেশে দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলা হয়। দিনাজপুরে ছাত্রধর্মঘট ও বাংলা ভাষার দাবিতে বিরাট মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। পাবনায় সকল স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী ক্লাস ত্যাগ করে 'বাংলা ভাষার দাবি মানতে হবে' ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে মিছিল করে শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে সভা অনুষ্ঠিত হয়—সেখানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়; এছাড়া সন্ধ্যার পর টাউন হলেও ছাত্রসভা আয়োজিত হয়েছিল। মুন্সীগঞ্জ শহরেও অনুরূপভাবে হরতাল, শোভাযাত্রা, জনসভা সবই হয়েছিল।

২৮ ফেব্রুয়ারি : রাষ্ট্রভাষা সাবকমিটির সিদ্ধান্ত

'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা বশীর আল হেলাল জানাচ্ছেন : ২৮ ফেব্রুয়ারি তমদ্দুন মজলিস ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের যুগ্ম রাষ্ট্রভাষা সাব-কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পাকিস্তান গণপরিষদের সরকারি ভাষার তালিকা থেকে বাংলা ভাষা বাদ দেয়ায়, পাকিস্তানের মুদ্রা ও ডাকটিকেটে বাংলা ভাষা ব্যবহার না করায় এবং নৌবাহিনীতে নিযুক্তি পরীক্ষা থেকে বাংলা ভাষা বাদ দেয়ার প্রতিবাদে আগামী ১১ মার্চ সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট করা হবে।

এ-দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্ররা ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে এসে যোগ দেয় প্রতিবাদ সভায়। পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সম্পাদক মঈনুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে এ সভা থেকে দাবি জানানো হয়, বাংলাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।

১ মার্চ ১৯৪৮ : যুক্ত বিবৃতি

১ মার্চ, ১৯৪৮ তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক অধ্যাপক আবুল কাশেম, পূর্বপাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য শেখ মুজিবর রহমান বিএ, নঈমুদ্দিন আহমদ বিএ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের নেতা আব্দুর রহমান চৌধুরী ঢাকায় এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন : তমদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্রভাষা সাবকমিটির এক যুক্ত অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১১ মার্চ পূর্বপাকিস্তানের সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়েছে, এ সম্পর্কে বিস্তারিত কর্মপন্থা যথাসময়ে প্রচারিত হবে। ইতোমধ্যে আমরা পূর্বপাকিস্তানের সমস্ত দেশপ্রেমিক গণনেতা, ছাত্র ও যুব কর্মীগণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি ধর্মঘটকে সম্পূর্ণ সফল করার জন্য যেন তাঁরা এখন থেকে প্রস্তুত থাকেন।[২৬]

২ মার্চ : সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

তমদ্দুন মজলিস ও তার প্রতিষ্ঠাতা আবুল কাশেমের আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ভিন্ন মত ও পথের একাধিক ব্যক্তি এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগতভাবে থাকলেও সাংগঠনিকভাবে কেউ যুক্ত ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঞা ছিলেন তার আহ্বায়ক। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ হয় ২ মার্চ, ১৯৪৮।

গণপরিষদের সিদ্ধান্ত এবং মুসলিম লীগের বাংলা বিদ্বেষী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ ছাত্রলীগ, বিভিন্ন ছাত্রাবাস এবং তমদ্দুন মজলিসের যৌথ উদ্যোগে ২ মার্চ ১৯৪৮ ফজলুল হক হলে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কামরুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় উপস্থিত উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন কামরুদ্দিন আহমদ, রণেশ দাশ গুপ্ত, অজিত গুহ (প্রগতিশীল লেখক সংঘ), আবুল কাশেম (তমদ্দুন মজলিস), নঈমউদ্দিন, তফাজ্জল আলী (পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ), মোহাম্মদ তোয়াহা (গণতান্ত্রিক যুবলীগ), শহীদুল্লাহ কায়সার (ছাত্র ফেডারেশন) এবং সরদার ফজলুল করিম ও তাজউদ্দিন আহমদ প্রমুখগণ।'[২৭]

অবশ্য বশীর আল হেলালের 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস' গ্রন্থে ২ মার্চের এ সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে আরো কয়েকজনের নাম পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা হলেন সামসুদ্দীন আহমদ, কাজী গোলাম মাহবুব, আলী আহমেদ, মহীউদ্দীন, আনোয়ারা খাতুন, শামসুল আলম, শওকত আলী, আব্দুল আউয়াল, অলি আহাদ, শামসুল হক, লিলি খান ও অন্যান্য। এ দিনের সভায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে আরো বেগবান ও কার্যকর করার জন্য নতুনভাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের একটি কর্মপরিষদ গঠিত হয়। এই ১১ সদস্য হচ্ছেন : আবুল কাশেম, শামসুল আলম, নঈমউদ্দিন আহমদ, কামরুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আব্দুর রহমান চৌধুরী, শামসুল হক, লিলি খান ও আনোয়ারা খাতুন।

পূর্ব ঘোষিত ১১ মার্চের ধর্মঘট সফল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য এই কর্মপরিষদ ফজলুল হক হলে ৪ ও ৫ মার্চ পরপর দুদিন বৈঠক করে। সব শেষে ১০ মার্চ রাতে ফজলুল হক হলে সার্বিক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়ে চূড়ান্তভাবে আলোচনায় বসে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। কে কোথায় কখন পিকেটিং করবে, ওই অবস্থায় কেউ গ্রেফতার হয়ে গেলে শূন্যস্থান পূরণে কে এগিয়ে আসবে, এ আন্দোলনের সঙ্গে সাধারণ জনগণকে কীভাবে সম্পৃক্ত করা সম্ভব—এসবই বিস্তারিত আলোচনা করে ১১ মার্চের কর্মসূচিকে সুসংগঠিত রূপ দেয়া হয়। এমন কি ঢাকার বাইরে মফস্বল শহরগুলোতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা ভাষা আন্দোলনকে ধরে রাখা এবং কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত রাখার বিষয়েও আলোচনা হয়।

১১ মার্চ ১৯৪৮ : ভাষা আন্দোলনের সুসংগঠিত যাত্রা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ছাত্ররা ১১ মার্চ বৃহস্পতিবার খুব ভোর থেকেই রাস্তায় নেমে আসে পিকেটিংয়ের জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই কলেজছাত্ররাও যুক্ত হয়। রেলওয়ে ওয়ার্কশপের পূর্বনির্ধারিত তিনটি স্থান ছাড়াও নীলক্ষেত, পলাশী ব্যারাকসহ বিভিন্ন পয়েন্টে ছড়িয়ে পড়ে ছাত্ররা। রমনা ডাকঘরের সামনে থেকে পিকেটারদের ১৩-১৪ জনকে পুলিশ এসে গ্রেফতার করে। হাইকোর্টের গেটের সামনে পিকেটাররা ব্যারিকেড গড়ে তুললে উকিলরা ভেতরে যাবার জন্য ছাত্রদের বুঝাতে চেষ্টা করে। তার অনড়, অনমনীয়। পুলিশ এসে বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। তখন এ অত্যাচারের প্রতিবাদে উকিলরাও সেদিনের জন্য আদালত বর্জন করেন। ছাত্ররা সেক্রেটারিয়েটের সামনেও স্লোগান দিয়ে অফিস বর্জনের আহ্বান জানিয়ে পিকেটিং করে। শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ প্রমুখ আব্দুল গনি রোডের ১ম গেটে এবং কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী, বরকত প্রমুখ তোপখানা রোডে ২য় গেটে পিকেটিং করেন। পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কি। পুলিশের লাঠিচার্জ। শওকত আলী চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েন পুলিশের গাড়ির সামনে। সেখান থেকে শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব ও বরকতকে গ্রেফতার করে ওয়াইজঘাটের কোতোয়ালি থানায় নিয়ে গেলে দেখা যায়

১১ মার্চ ১৯৪৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের পশ্চাতে (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ ভবন) বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্র-জনতার সচিবালয়মুখী মিছিল

শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ ও অন্যান্য অনেককে আগেই গ্রেফতার করে আনা হয়েছে।

আসলে ১১ মার্চের কর্মসূচি বানচাল করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়। একদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সরকারি বাহিনী, সেই সঙ্গে যুক্ত হয় সরকারের লেলিয়ে দেয়া গুণ্ডা বাহিনী। তারা বেপরোয়া সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ১১ মার্চের আন্দোলনে আহত হন ২০০, তার মধ্যে গুরুতর আহত ১৮; গ্রেফতার ৯০০, তার মধ্যে অনেককে ছেড়ে দেয়া হয়, জেলবন্দি ৬৯ জন। ১১ মার্চের আন্দোলন শুধু ঢাকা শহরে সীমিত থাকেনি, দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা শহরে। পুলিশী নির্যাতন ও গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে সেসব আন্দোলন দমনের চেষ্টা হয়। এদিকে ১১ মার্চের পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং বন্দি মুক্তির দাবিতে ১২ মার্চও নানা প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়। জগন্নাথ কলেজের প্রতিবাদ সভায় শতাধিক বহিরাগত গুণ্ডা আক্রমণ চালায়। ১৩ মার্চ আবার ধর্মঘট। ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পালিত হয় ধর্মঘট। এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয় ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাবার। কারণ ওই ১৫ তারিখেই ছিল পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভা, বা আইন পরিষদ (বা প্রাদেশিক পার্লামেন্ট)-এর প্রথম অধিবেশন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের ব্যাপারটা এতই স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়ে ওঠে যে তা হঠাৎ বন্ধ করাও কঠিন কাজ হয়ে ওঠে। ১৫ তারিখেও ধর্মঘট হয়। পুলিশও তার ধরপাকড়, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ—ইত্যাদি নির্যাতন চালিয়ে যেতে থাকে। এদিকে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল 'কায়দে আজম' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রথম ঢাকা-সফরের দিনও এগিয়ে আসছে (১৯ মার্চ)। দেশের অবস্থা স্বাভাবিক দেখাতে হবে। এ রকম নাজুক অবস্থায় পড়ে প্রধানমন্ত্রী নাজিম উদ্দীন ১৫ মার্চ সকালেই অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইলেন। বলা যায় আপোষ প্রস্তাব দিলেন।

আপোষ প্রস্তাব : প্রথম বিজয়

পূর্ববঙ্গের (পূর্ব পাকিস্তানের) দোর্দণ্ড প্রতাপশালী প্রথম মুখ্যমন্ত্রী (প্রধানমন্ত্রী) উর্দুপ্রেমিক খাজা নাজিমউদ্দীন অবস্থা বেগতিক দেখে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ১৫ মার্চ আলোচনার প্রস্তাব দিলে নেতৃবৃন্দ প্রথমে ফজলুল হক হলে বসে নিজেদের মধ্যে আলোচ্যসূচি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করে। এই সিদ্ধান্তের আলোকেই ১৫ মার্চ সকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয় সংগ্রাম পরিষদের। বিস্তর বাকবিতণ্ডাও হয়। কিন্তু গরজ বড় বালাই। কৌশলগত কারণে খানিকটা নতজানু হয়ে প্রধানমন্ত্রীকেই এগিয়ে আসতে হয়। ছাত্রদের আনীত ৭-দফা চুক্তিনামায় সই করতে রাজি হন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন। সেই ৭ দফার মধ্যে ছিল—১. বন্দি মুক্তি, ২. তদন্ত অনুষ্ঠান, ৩. ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার, ৪. আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা রহিত, ৫. বাংলাকে প্রাদেশিক সরকারি ভাষার মর্যাদা, ৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সংসদীয় সভায় বাংলা প্রচলন, ৭. সংবাদপত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ইত্যাদি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমা চেয়ে একটি বিবৃতি দেয়ার জন্য ছাত্ররা চাপ দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আপোষ-রফা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ৭ দফার শেষে নিজে হাতে লিখে দিলেন ৮নং দফা :

> ৮. সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।

আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এই চুক্তিনামা ছিল ঐতিহাসিক বিজয়। কারণ একজন প্রধানমন্ত্রীকে শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের কাছে শুধু মাথা নোয়াতে হয়েছিল এমন নয়, এতকাল আন্দোলন মাত্রই রাষ্ট্রের দুশমন দ্বারা প্ররোচিত অথবা কমিউনিস্টদের উস্কানি এমন অপপ্রচার থেকে সরকারকে নেমে আসতে হয়েছিল। আন্দোলনের আপাত বিজয় এইখানে। অবশ্য এই খাজা লোকটা এই রকমই—ঠেলায় পড়লে ঢেলায় সালাম করতে বাধে না তার। এর আগেও করাচিতে গণপরিষদে বাংলার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়ে ঢাকায় ফিরলেই ছাত্ররা তাকে ঘেরাও করে, ক্ষমা চাইতে বলে। 'ফান্দে পড়িয়া' তিনি বাংলার পক্ষে লেখা বিবৃতিতেও সেবার সই করেন; এমনকি প্রাণভয়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও তিনি ঘটিয়েছেন।

আপোস চুক্তি সাক্ষর ও বন্দিমুক্তি

১৫ মার্চ ১৯৪৮ পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আলোচনাক্রমে ৮ দফা চুক্তির খসড়া প্রস্তুত হলে সেটা নিয়ে আবুল কাশেম ও কামরুদ্দিন আহমদ যান জেলখানায়। সেখানে আটক শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য রাজবন্দি সেই খসড়া দেখে চুক্তির প্রতি সম্মতি[২৮] দেবার পর সরকারের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ও সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে কামরুদ্দিন আহমদ তাতে সাক্ষর করেন।

এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ১৫ মার্চ সন্ধ্যায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতাগণ মুক্তি পান।

একটি বিভ্রান্তি, আবার বিক্ষোভ-ধর্মঘট

চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের খবর সাধারণ ছাত্রদের কাছে অজানা থাকায় ১৫ মার্চ বিক্ষোভ ও উত্তেজনা চলতেই থাকে। চুক্তি অনুযায়ী বিক্ষোভ বন্ধের কথা বললে সাধারণ ছাত্রদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, নেতাদের ঘেরাও করে রাখে ছাত্ররা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে নেতারা ১৬ মার্চ পুনরায় সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানাতে বাধ্য হন। শুধু তাই নয়, বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ছাত্ররা সংসদ ভবনের দিকে যাত্রা করে। কিন্তু এটা চুক্তির বরখেলাপ বলেই সংসদে এ নিয়ে তুমুল হট্টগোল সৃষ্টি হয়।

এদিকে ১৫ মার্চ সন্ধ্যায় জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ১৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়।[২৯] সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে এ্যাসেম্বলি ঘেরাও করার জন্যে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যান এবং আইন পরিষদের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এ সময় বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। পুলিশের হামলার প্রতিবাদে ১৭ মার্চ ছাত্রধর্মঘট আহ্বান করা হয় এবং তা পালিত হয়।[৩০]

ভাষার লড়াই : ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে

শুরুটা হয় পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকাতেই, সচেতন ছাত্রদের নেতৃত্বে; কিন্তু ১৯৪৮ সালের মার্চ নাগাদ এই ভাষার লড়াই ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে এবং লড়াইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে অন্যান্য প্রেণীপেশার মানুষ। ধীরে ধীরে সকল স্তরের মানুষ বুঝতে পারে—ব্যাপারটা শুধু ছাত্র সমাজের নয়, এখানে স্বার্থ আছে সবার, সব বাঙালির। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা তো বটেই, প্রশ্নটা নিজের অস্তিত্ব রক্ষারও, এমনকি নিশ্চিন্তে খেয়েপরে বাঁচারও। কাজেই ১৯৪৮ সালে ভাষাকে কেন্দ্র করে ছাত্র-জনতার এই লড়াই দেশের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ছোট্ট বন্ধুরা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গবেষক ড. মোহাম্মদ হাননান এ প্রসঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন মর্মস্পর্শী ভাষায়। তোমাদের জন্য সেই অংশটুকু তুলে দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন :

> পাবনায় স্কুলের ছাত্র আমিনুল ইসলাম বাদশার নেতৃত্বে সকল বয়সের মানুষ রাস্তায় নেমে বাংলার দাবিতে স্লোগান দিতে

থাকল। ২৮ ফেব্রুয়ারি সরকার ভয় পেয়ে পাবনায় ১৪৪ ধারা জারি করল। কিন্তু ছাত্ররা এ সব আইনে ভয় পেল না। তারা এগিয়ে চলল। ফলে স্কুল কলেজের অনেক ছাত্রই গ্রেফতার হয়ে গেল। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে যিনি ছাত্রদের বিচার করে জেল দেবেন, সেই জজ সাহেবের স্ত্রীই জেলের ভেতর ছাত্রদের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন গরম দুধ আর ঠাণ্ডা পানি। তিনি ছাত্রদের কাছে খবর পাঠালেন, মায়ের এই স্নেহ যেন ছাত্ররা ফিরিয়ে না দেয়। যশোরেও ছাত্ররা যাতে বাংলা ভাষার পক্ষে মিছিল করতে না পারে তার জন্য সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু ছাত্ররা এসব বাধা মানবে কেন? ফলে পুলিশ-ছাত্র সংঘর্ষ হয়ে গেল। ছাত্রদের ইটের আঘাতে ওসি আব্দুল জব্বারের কান কেটে গেল। গুলি করার হুকুম দেবেন যে ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁর মেয়ে রুবী আহমদও নেমে পড়েছে মিছিলে। চাঁদপুরে ওসমানিয়া মাদ্রাসার ছাত্ররাই মিছিল বের করল। একটা সভা করে মাদ্রাসার ছাত্ররা বাংলার সন্তান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে অভিনন্দন জানাল বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যে।

এমনি করে ১৯৪৮ সালের ভাষার লড়াই সারাদেশের মানুষকে একত্রিত করে ফেলল বাংলা ভাষার পক্ষে। কিছু কিছু পরগাছা, দালাল শ্রেণীর লোক মনে মনে উর্দুর পক্ষে ওকালতি করার চিন্তা করলেও এ-যাত্রা ভয়ে মুখ তালাবন্ধ করে রাখল।[৩১]

জিন্নাহ এলেন ঢাকা : পুরনো সেই হুঙ্কার

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তিনি কায়দে আযম, জাতির পিতা। পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট। না, তখন বলা হতো গভর্নর জেনারেল। তাঁকে নিয়ে পাকিস্তানের উভয় অংশের মানুষের কত আবেগ, কত ভক্তি! সেই অতি শ্রদ্ধার মানুষটি ঢাকায় এলেন ১৯ মার্চ ১৯৪৮। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম আগমন। কত আয়োজন এই আগমনকে ঘিরে! রাস্তায় রাস্তায় ব্যানার ফেস্টুন তোরণ। রমনার রেসকোর্স ময়দান (এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সাজানো হচ্ছে নতুন সজ্জায়। এইখানে এসে তিনি দেখা দেবেন পূর্ববঙ্গের (পূর্ব পাকিস্তান) লোকজনকে। এইখানে দাঁড়িয়ে তিনি বক্তৃতা করবেন। অনেকের প্রত্যাশা—এইবার একটা কিছু সমাধান হবে। তিনি দেশের মাথা। দেশের অর্ধেকেরও বেশি মানুষের মনের কথা,

প্রাণের দাবি, চোখের ভাষা তিনি বুঝবেন না, তাই হয়! স্বাধীনতার (১৯৪৭) পর থেকে দেশের পূর্ব অংশে এত যে হইচই, এত যে আন্দোলন সংগ্রাম, দেশের প্রতিষ্ঠাতা যিনি, তিনি বুঝবেন না—এ সবের মানে কী? কী চাই তাদের?

না, তিনি কিছুই বুঝতে চাইলেন না। 'জাতির পিতা' হয়েও তিনি দেশের অধিকাংশ মানুষের ইচ্ছের বিপরীতেই দাঁড় করালেন নিজেকে। ২১ মার্চ রেসকোর্স মাঠের বক্তৃতায় তিনি সেই পুরনো হুঙ্কারই শোনালেন—'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।'

বাহ! এই নাকি জাতির পিতার কথা! সবই অবাক।

তিনি আরো বললেন, অন্যভাষার দাবি যারা তোলে তারা নাকি পাকিস্তানের দুশমন, ইসলামের শত্রু!

তার মানে? পাকিস্তানের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ তো উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও দেখতে চায় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। তাহলে কি তারা সবাই দেশের ও ধর্মের শত্রু? বলে কী লোকটা? এ কেমন হিসেব তাঁর?

শুধু রেসকোর্সে নয়, ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও তিনি বললেন সেই একই কথা, একই সুরে। উর্দু ছাড়া অন্য ভাষা চলবেই না। কিন্তু এটা যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়! এটা যে ভাষা আন্দোলনের সূতিকাগার! এখানেও ওই কথা! ছাত্ররা সেটা মানবে কেন? ওদের কি ভয়-ডর আছে, না পিছুটান আছে? ওরা চিৎকার করে প্রতিবাদ জানায়—না, না। জিন্নাহ প্রথমে স্তম্ভিত! গভর্নর জেনারেলের মুখের উপরে প্রতিবাদ! কিন্তু এরা যে বাংলার বিচ্ছু! সহজে ছাড়ার পাত্র!

এ দিন (২৪ মার্চ ১৯৪৮) সন্ধ্যায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে জিন্নাহর একটি নির্ধারিত বৈঠক হয়। সেখানে তিনি সাফ জানিয়ে দেন—পূর্ববঙ্গে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পাদিত ৮ দফা চুক্তি তিনি মানেন না। ওটা তখন জোরপূর্বক করানো হয়েছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার রাজনৈতিক ও সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক যুক্তি তুলে ধরে একটি স্মারকলিপি বৈঠকের পূর্বেই জিন্নাহকে দেয়া হয়েছিল। নিশ্চয় সেটা তাঁর মনে ধরেনি। আবারো বৈঠকে বসে ছাত্রনেতারা রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করলে তিনি রেগে মেগে বেসামাল হয়ে ওঠেন। বেফাঁস বলে বসেন—তিনি ছাত্রদের কাছে রাজনীতি শিখতে আসেননি।

এরই মাঝে মাগরিবের আযান শুরু হলে ছাত্ররা শেষবারের মতো ফোঁড়ন কাটে, স্যার কি এখন নামাজ পড়বেন?

কথিত আছে, ইসলামের জন্যে জান কোরবান করা এই নেতা ঠিকমতো নামাজও পড়েন না। তাই ছাত্রদের এই কটাক্ষে এতটাই রেগে যান যে গালিগালাজ করতে করতে সে বৈঠক ভেঙে দেন।

জিন্নাহ্‌র পূর্ববঙ্গ সফর, তার প্রতিক্রিয়া

প্রতিক্রিয়া হয়েছিল মনস্তাত্ত্বিক এবং ভয়ঙ্কর।

নতুন রাষ্ট্রের বয়স বছর না গড়াতেই সচেতন ছাত্র সমাজের বিদ্রোহী হাত ধরে ভাষা আন্দোলন প্রায় সাফল্যের প্রথম সোপান অতিক্রম করে, পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নাজিমউদ্দীনকে চুক্তি সাক্ষরে বাধ্য করা সম্ভব হয়। কিন্তু জিন্নাহ ঢাকায় এসে ২১ ও ২৪ মার্চ কুটবুদ্ধি ও চাতুর্যপূর্ণ বক্তব্য দেয়ার ফলে আন্দোলনের মূল খাত খানিকটা গেল পাল্টে, লক্ষ্যও যেনবা হলো সাময়িক বিভ্রান্ত।

ভাষার প্রশ্নেই শুরু হয়েছিল আন্দোলন। বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা। এই মাতৃভাষার আয়নাতেই বাঙালি আপন সংস্কৃতির মুক্তি এবং মেধা বিকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজতে শুরু করে। জিন্নাহ তাঁর চাতুর্যপূর্ণ বক্তৃতায় বলেন, ওটা ভুল পথ, পাকিস্তানকে ধ্বংস করার পথ। তাঁর এই দ্বিধাহীন বক্তব্য পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নাজিমউদ্দীনকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে, সাধারণ মানুষকে যথেষ্ট বিভ্রান্ত করে—সত্যিই ছাত্রদের কথায় লাফালাফি করে ভুল হচ্ছে না তো! সত্যি সত্যি হিন্দু এবং কম্যুনিস্টরা উস্কানি দিচ্ছে না তো!

এদিকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল যে তমদ্দুন মজলিস, তাদের উৎসাহেও যেন ভাটা পড়ে। মওলানা আকরাম খাঁর মতো বর্ষীয়ান নেতা এরপর শুধু নীরব হয়ে গেলেন তাই নয়, ধীরে ধীরে বিপরীত স্রোতে গা ভাসালেন। হয়তো বা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং দেশের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্যে ১৯৪৮ সালের ৮ এপ্রিল পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভায় (এখানকার সংসদ) রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাস করালেন খাজা নাজিমউদ্দীন। সেই প্রস্তাবে বলা হলো :

১. পূর্ববাংলা প্রদেশে ইংরেজির স্থলে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হইবে। এবং যত শীঘ্র বাস্তব অসুবিধাগুলো দূর করা যায় তত শীঘ্র তাহা কার্যকর করা হইবে।

২. পূর্ববাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মাধ্যম হইবে 'যথাসম্ভব' বাংলা অথবা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ স্কলারদের ভাষা।

প্রস্তাবগুলো শুনতে যতই মধুর মনে হোক, চাতুরীভরা এ প্রস্তাব মূলত

পূর্বে সম্পাদিত ৮ দফা চুক্তি ও ৪নং দফার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। নাজিমউদ্দীন নিজেও স্বীকার করেন, ঐ চুক্তি স্বাক্ষরের মতো পরিবেশ এখন আর নেই। মুখ্যমন্ত্রীর এই ওয়াদা খেলাপ নিয়ে কোথাও কোনো প্রতিবাদও হলো না। এই পশ্চাদপসারণের দৃশ্যের পর্যালোচনা করতে গিয়ে গবেষক অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ গভীর পরিতাপের সঙ্গে বলেন :

> রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শিশুটি আঁতুড় ঘরেই মারা গেল। শুধু তার স্মৃতি রয়ে গেল কিছু : ১৯৪৮-এর ১১ ই মার্চ। 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' হিসেবে দিনটি পালিত হতে লাগলো ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫১ সাল ধরে।[৩২]

ভাষার লড়াই : স্তিমিত দীপশিখা

বাঙালির ভাষার লড়াইয়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত বাঙালির জাতিসত্তার প্রশ্নটি। পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকেরা নতুন দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি না দিয়ে মূলত বাঙালির এই জাতিসত্তাকেই অস্বীকার এবং অপমান করেছে। তারা ধর্মের মোড়কে ঢেকে ভাষাভিত্তিক জাতি পরিচয়কে আড়াল করতে চেয়েছে, বাঙালিত্বের গৌরবময় সংস্কৃতি মুছে দিতে চেয়েছে। কিন্তু তাই কিছুতেই হয়। এভাবে আত্মপরিচয় হারাতে চাইবে কেন বাঙালি? রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নকে ঘিরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা বাঙালির ভাষার লড়াই ১৯৪৮ এর পর খানিকটা স্তিমিত হয়েছে নেতৃত্বের দোদুল্যমানতাসহ নানাবিধ কারণে, তাই বলে এ দেশের আপামর বাঙালি জনসাধারণের স্বপ্নসাধ বা আশা-আকাঙ্ক্ষার দীপ শিখাটি নিঃশেষে নিভে যায়নি। বাঙালিত্বের এই দীপশিখা যে চির অনির্বাণ। হয়তো বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে ধূমায়িত থেকেছে, একেবারে নিভে যায়নি কখনোই।

ধরা যাক ১৯৪৮ সালের ২৭ নভেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের ঢাকা-সফরের কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এক সমাবেশে লিয়াকত আলী খানের কাছে ডাকসুর পক্ষ থেকে দাবিনামা পেশ করা হয়। অন্যান্য দাবি দাওয়ার সঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করার এবং পূর্ববঙ্গ আইনসভায় (সংসদ) গৃহীত প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ এই প্রসঙ্গটি কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে ছাত্রদের অন্যান্য কিছু দাবি মেনে নেন। রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত দাবিটি এড়িয়ে যাওয়ায় সমাবেশে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

১৯৪৮ সালের শেষ আঘাত : করাচির শিক্ষক সম্মেলন

নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর, করাচিতে। এবারও নাটের গুরু বাংলা-বিরোধী বঙ্গসন্তান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুল রহমান। উর্দুভাষী পাকিস্তানি শাসকদের তোষণ করে নিজের মন্ত্রীত্বের গদি ঠিক রাখার জন্যে মানুষ যে কত নিচে নামতে পারে, ধূর্ত এই লোকটি তার বড় দৃষ্টান্ত। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার যতগুলো ষড়যন্ত্র বা চক্রান্তের ঘোঁট পাকায়, তার সবগুলোতেই নির্লজ্জভাবে তিনি আছেন এবং আরবি হরফে বাংলা লেখার সবচেয়ে জঘন্য চক্রান্তটিও করেন এই লোকটি। ছোট্ট বন্ধুরা, পৃথিবীর এমন অনেক ভাষা আছে যার নিজস্ব বর্ণমালা নেই, মানে হরফ নেই; তারা অন্যভাষার হরফ ধার নিয়ে সেই পরের হরফে নিজেদের কথা লেখে। তাদের কেমন দুঃখ বলো তো! আমাদের বাংলা ভাষার কিন্তু সে সমস্যা নেই। আমাদের আছে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত হরফ-বিন্যাস। এই হরফেই চর্যাপদ থেকে আজ পর্যন্ত কত না সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান রচিত হয়ে চলেছে, আর সেদিন কিনা পাকিস্তানের দালাল বঙ্গসন্তান ফজলুর রহমান এই সোনার হরফ বাতিল করে আরবি হরফ দিয়ে বাংলা লেখার চক্রান্ত করেন! পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু করেও প্রাণের আশ মেটে না এদের। ধ্বংস করতে চায় বাংলা ভাষা, বাঙালির বুকের দৃপ্ত অহংকার। বিশিষ্ট গবেষক পণ্ডিত বদরুদ্দীন উমর যথার্থই বলেছেন—'বাঙলাদেশের প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমানই ছিলেন এই হরফ পরিবর্তন প্রচেষ্টার 'দার্শনিক' এবং 'মূলপ্রবক্তা'।

ষড়যন্ত্রের নতুন মাত্রা : আঘাত বাংলা বর্ণমালায়

আবার সেই ধর্মের দোহাই। গণবিচ্ছিন্ন শাসকদের এটাই বুঝি চরিত্র। নিজেদের অপকর্ম লুকাতে চায় ধর্মের পর্দা টেনে। আরবি ভাষার প্রতি মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ এবং শ্রদ্ধাবোধ থাকতেই পারে। তাই বলে জনগণের সেই আবেগকে শাসকেরা যদি নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে চায়, তার উদ্দেশ্যকে অসৎ, অসাধু না বলে কী উপায়? পাকিস্তানের কর্তারা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে জোর করে উর্দুকে চাপিয়ে দিয়ে বাংলার বিরুদ্ধে প্রথম অপরাধ করেছে। এবার বাংলা হরফকেই সমূলে উচ্ছেদের পাঁয়তারা করে। ১৯৪৯ সালের গোড়াতেই জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষাগুলোকে আরবি হরফে লেখার সুপারিশ করেছে। প্রাদেশিক ভাষাগুলো মানে তো পাঞ্জাবি, হিন্দি, বালুচি পশতু; এগুলো তো

প্রায় আরবির মতো হরফেই লেখা হয়। মূল টার্গেট তাহলে বাংলা। বাংলা ভাষারই আছে সমৃদ্ধ নিজস্ব হরফ। পাকিস্তানি শাসকেরা আঘাত হানতে চায় এই বাংলা হরফেই। বাংলা লিখতে হবে আরবি হরফে।

এদেশের ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবী এ চক্রান্ত মানবে কেন? চোখের সামনে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করে জেগে ওঠে বাংলা বর্ণমালা। অ-এ অজগর আসছে তেড়ে। বাঙালিরা এই অজগরকে চিনতে পারে। আবারো তারা গর্জে ওঠে, ফুঁসে ওঠে, প্রতিবাদ জানায় দুহাত নেড়ে। আরবি হরফ প্রবর্তনের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চলে, সারাদেশে প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। না, বাঙালি কিছুতেই মানবে না এই গভীর চক্রান্ত।

ষড়যন্ত্রের কলকাঠি নাড়া হচ্ছিল কেন্দ্র থেকে। মানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানই সমস্ত কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করেন। অবশ্য তার বেশ কজন ঢাকের বায়াও জুটে যায়। তার মধ্যে প্রাদেশিক শিক্ষাসচিব ফজলে আহমদ করিম ফজলী অন্যতম। বাংলা ধ্বংসের চক্রান্ত বাস্তবায়নে কেন্দ্র থেকে বিপুল অর্থ বরাদ্দও পাওয়া যায়। পূর্ব বাংলার সর্বত্র সে টাকা তাঁরা দুহাতে ছড়াতে থাকেন। এরই মধ্যে এই অশুভ চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠলে ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক সরকার 'পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি' নামে একটি শক্তিশালী বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি গঠনের উদ্দেশ—পূর্ববাংলায় প্রচলিত বাংলা ভাষা প্রমিতকরণ, সহজীকরণ ও সংস্কারের বিষয় বিবেচনা করা। মজার ঘটনা হচ্ছে, এই কমিটি শেষ পর্যন্ত আরবি হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে জোরালো মত প্রকাশ করে।

সরকারের কিছু নির্লজ্জ স্তাবক দালাল ছাড়া শুভবোধসম্পন্ন কোনো মানুষই হরফ পরিবর্তনের প্রস্তাব মানতে পারেনি। বিরোধিতা করেছেন অনেকেই। অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁর মতো পাকিস্তানপন্থী লোকও মন্তব্য করেন : 'হরফ দ্বারা কখনো সাংস্কৃতিক মিলন ঘটে না। এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় যে হাজার হাজার পুস্তক লেখা হয়েছে কে সেগুলোকে আরবি হরফে নতুন করে লিখবে? তাই হরফ পরিবর্তন যেমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে তেমনি পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনবে।'

পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক সরকারের হাতে এ ধরনের পরিষ্কার রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু 'রাষ্টভাষা' প্রশ্নে তাদের অবস্থান থেকে মোটেই সরে আসে না। উর্দুকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নিত্যনতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন, কমিটি গঠন, চক্রান্ত চালানো—অব্যাহত থাকে। ফলে এইসব অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গ জুড়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধও চলতে

থাকে। ১৯৪৯ সালে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরপরই শেখ মুজিব রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আবারো বেগবান করার লক্ষ্যে তাজউদ্দিন আহম্মদ, মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং নানাবিধ উদ্যোগ নেন।

পূর্ববঙ্গে খাদ্য ঘাটতির কারণে ১৯৪৯ সালে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সংকট মোকাবিলায় সরকারের উদাসীনতা বাড়িয়ে তোলে জনদুর্ভোগ। এমনই প্রেক্ষাপটে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে শেখ মুজিবও বিশাল এক ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দেন। এ অপরাধে সরকার দুজনকেই কারারুদ্ধ করে।

আওয়ামী লীগের জন্ম : নতুন আশার আলো

মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পূর্ববঙ্গের মানুষ অন্ধ সমর্থন জানিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মাত্র দুবছরের মধ্যেই তারা মুসলিম লীগের স্বৈরশাসন এবং সীমাহীন পক্ষপাতিত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করে। এরই মাঝে যুব আন্দোলন সুসংগঠিত রূপ লাভ করে। এমনই পরিস্থিতিতে ১৯৪৯ সালের ৩ জুন ঢাকার রোজগার্ডেনে আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। তখন এ দলের নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের নেতৃত্ব অবাঙালি উপরতলার মানুষের হাতের মুঠোয় কুক্ষিগত হয়ে পড়ায় সাধারণ জনগণের পক্ষে কথা বলার জন্যে নতুন দলের সৃষ্টি প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে। সেই প্রেক্ষাপটে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের প্রগতিশীল বাঙালি নেতাদের অনেকেই একত্রিত হয়ে গড়ে তোলেন এই নতুন সংগঠন। আতাউর রহমান খান, আব্দুস সালাম খান ও আবুল মনসুর আহমদ হন এ দলের সহসভাপতি। সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক। কারাবন্দী অবস্থাতেও শেখ মুজিব দলের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। গণমানুষের এই রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব স্তিমিতপ্রায় ভাষা আন্দোলনেও নতুন করে আশার আলো সঞ্চারিত করে। এ সময়ে বাঙালি ছাত্র ও শিক্ষিত শ্রেণী একদিকে যেমন জঙ্গি মনোভাব নিয়ে হরফ চক্রান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ভাষা সংস্কার, ব্যাপক উর্দু শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সরকার গঠিত মূলনীতি কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এদেরই তৎপরায় এবং উর্দুবাদীদের নানামুখী ষড়যন্ত্রমূলক চাপের কারণে বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত ক্রমশ ব্যাপক হতে শুরু করে। এভাবেই বছর গড়িয়ে আসে ১৯৫০ সাল।

আবারো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কমিটি

১৯৫০ সাল। ১১ মার্চ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্রছাত্রীরা ১৯৪৮

সালের এই দিনের স্মরণে 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালনের উদ্দেশে সমবেত হয়েছে। এমনই হয়ে আসছে গত বছর থেকে। কিন্তু খানিকটা যেন ঢিলেঢালা ভাব। দেশে চলছে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে নানামুখী চক্রান্ত। পাকিস্তান সরকারের নিত্যনতুন ফন্দিফিকিরের শেষ নেই। এ সময় মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াই আরো ঐক্যবদ্ধ এবং জোরদার হওয়া দরকার। এই উপলব্ধি থেকে এগিয়ে এলেন বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা আব্দুল মতিন। বড় হয়ে তোমরা জানতে পারবে—'ভাষা মতিন' নামে তিনি অধিক পরিচিত হয়েছেন। তা এই আব্দুল মতিনের প্রস্তাবে এবং নেতৃত্বে ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ নবরূপে গঠিত হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি।' এ প্রসঙ্গে আব্দুল মতিন লিখেছেন :

> '১৯৪৮ সালের ১১ মার্চের দ্বিতীয় বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আহূত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সমাবেশে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র প্রতিষ্ঠান থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠনের মাধ্যমে দেশব্যাপী ছাত্রদের এবং তাদের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার প্রস্তাব করেছিলাম।'[৩৩]

এ প্রস্তাব সেদিনের ছাত্র সমাবেশে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীতও হয় এবং নতুনরূপে গঠিত এই 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি'র আহ্বায়ক নির্বাচিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩ বছরের জন্যে বহিষ্কৃত ছাত্রনেতা আব্দুল মতিন। তিনি বহিষ্কৃত হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারীদের আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের অপরাধে। সঙ্গে ছিলেন শেখ মুজিবও।

পতাকা দিবসের কর্মসূচি

ভাষা আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি এই অভিনব কর্মসূচি পালন করে। 'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা চাই' এবং 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' লেখা সম্বলিত কাগজের ছোট ছোট পতাকা ছেপে নিয়ে কর্মীরা সচিবালয়ের দুই গেটে এবং আশপাশের রাস্তায় অবস্থান নেয়। অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং পথচারী সাধারণ মানুষের হাতে সেই পতাকা তুলে দিয়ে তারা অর্থসহযোগিতার আহ্বান জানায়। এতে বেশ সাড়াও পাওয়া যায়। প্রথমত আন্দোলন

পরিচালনার জন্যে তহবিল গঠন; দ্বিতীয়ত ভাষা আন্দোলনেরই একটি কাজে অংশগ্রহণ কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করে; চতুর্থত যারা অর্থসহযোগিতা করেন তারাও ভাষা আন্দোলন সংশ্লিষ্ট তৎপরতা দেখে আশ্বস্ত হন, খুশি হন। সচিবালয়ের বাঙালি কর্মচারীরা সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে অনুষ্ঠিত ধর্মঘট মিছিল মিটিংয়ে সাধ্যমতো সহযোগিতা এবং অংশ গ্রহণ করে থাকে; এই নতুন উদ্যোগকেও তারা আন্তরিকভাবে সমর্থন জানায়।

প্রচারপত্র-পোস্টার-সভা-সমাবেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির আগে আগে ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বিভিন্ন প্রকার প্রচারপত্র ছাপিয়ে ছাত্রদের হাতে তুলে দিয়ে সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ জানায়—সবাই যেন নিজ নিজ এলাকায় এগুলি বিলি করার সাথে সাথে ছাত্রদের সংগঠিত করে মিছিল-মিটিং করে। এর ফলে জনগণও উদ্বুদ্ধ হবে। সম্পৃক্ত হবে। বাস্তবে এ কর্মসূচির সাফল্য পাওয়া যায়।

সংসদে হরফ পরিবর্তনের প্রস্তাব

আজ আমরা জাতীয় সংসদ বলি, পাকিস্তান আমলে বলা হতো গণপরিষদ। ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে আরবি হরফে বাংলা লেখার বিষয়ে পাকিস্তান গণপরিষদে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। কংগ্রেসের ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতারা এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। এ সময় আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি নানা ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে ঘৃণ্য ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।

বিপিসি (BPC) গঠন ও তার রিপোর্ট প্রদান

পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের উপায় নির্ধারণের উদ্দেশে গঠিত The Basic Principle Committee (BPC) of the National Constitutional Assembly এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদ রিপোর্ট জমা দেয়। এই রিপোর্টে আবারো উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। এই বিপিসি রিপোর্ট তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে পূর্ববাংলায়। আওয়ামী মুসলিম লীগ এ রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে।

পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত Committee of Action for Democratic Federation ১৪ নভেম্বর ১৯৫০ ঢাকায় আয়োজন করে Grand National Convention বা GNC (জিএনসি)। এই কনভেনশন থেকে বাঙালিদের মূল দাবিগুলোর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয় এবং উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১০ ডিসেম্বর মজলুম নেতা মওলানা ভাসানী জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরপরই বিপিসি রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেন এবং গ্রান্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলো অবিলম্বে মেনে নেয়ার জন্যে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

১৯৫১ : পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের জন্ম

অসাম্প্রদায়িক এবং শেকড়সন্ধানী সংগঠন পূর্বপাকিস্তান যুগলীগের জন্ম হয় ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারিতে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যুবলীগও বেশকিছু কর্মসূচি পালন করে। সরকারের চাপিয়ে দেয়া 'পাকিস্তানি সংস্কৃতি' প্রত্যাখ্যান করে পূর্ববাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি তথা আবহমানকালের বাঙালি সংস্কৃতি চর্চা ও লালনের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

২৩ ফেব্রুয়ারি : বুদ্ধিজীবীদের স্মারকলিপি

খাজা নাজিমউদ্দিনের জায়গায় তখন পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন। বাংলাকে সরকারি ভাষারূপে প্রবর্তনের প্রস্তাব সম্বলিত একটি স্মারকলিপি এদেশের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি সরকারকে দেয়া হয়। এতে সই করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ. ড. কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ পণ্ডিতেরা। সঙ্গে আরো লেখক সাংবাদিক, অধ্যাপক, রাজনীতিকও ছিলেন।

১১ মার্চ : আবার রাষ্ট্রভাষা দিবস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি পতাকা দিবস পালনের মাধ্যমে শুরু করে তাদের কার্যক্রম। এ রকম আরো একাধিক প্রচারণামূলক ও সাংগঠনিক কাজের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যায়। এরই প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রভাষা দিবস উদ্‌যাপনের যে কর্মসূচি গ্রহণ করে তার মধ্যে

অন্যতম ছিল ঢাকা শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে একটি প্রচারপত্রের প্রচার করা। ঐতিহাসিক সেই প্রচারপত্রে আহ্বান জানানো হয় :

> বাংলাকে এখনো অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হয়নি, শিক্ষার মাধ্যম করা হয়নি। বরং ঘৃণ্য বিপিসি সুপারিশে ষড়যন্ত্র করে বাংলাকে সরাসরি বাদ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলাকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশে আরবি হরফে বাংলা লেখার হীন চক্রান্ত করে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় করতেও অতটুকু লজ্জাবোধ করেনি। বন্ধুগণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কর্তৃপক্ষের এই ফ্যাসিস্ট মনোভাবকে সমূলে বিনষ্ট করে আমাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম ক্ষান্ত হতে পারে না। অতএব আসুন—আমরা ১১ মার্চ নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও সভা করে আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে স্মরণ করে পুনরায় লৌহদৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে ঘোষণা করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করি।[৩৪]

শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, ১৯৫১ সালের ১১ মার্চ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। রাস্তায় মিছিল বেরোয়। ভাষার দাবিতে ছাত্রদের মিছিলে এসে যোগ দেয় সাধারণ মানুষও। এভাবেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ বছর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় সংবিধান সভার সদস্যদের কাছে পাঠানোর জন্য একটি স্মারকলিপি প্রণয়ন করে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি সম্বলিত স্মারকলিপিটি প্রস্তুতের জন্যে হাবিবুর রহমান শেলী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী প্রমুখকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ইংরেজিতে লেখা উক্ত স্মারকলিপি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যদের কাছে এবং সেই সাথে বেশকিছু খবরের কাগজে পাঠানো হয়। তারই প্রেক্ষিতে সীমান্ত প্রদেশের প্রভাবশালী দৈনিক 'খাইবার মেইল'-এর সম্পাদকীয়তে স্মারকলিপির বক্তব্য সমর্থন করা হয়।

১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গণপরিষদ সদস্যদের উদ্দেশে স্মারকলিপি পাঠানোর পাশাপাশি ছাত্রসমাজকে চূড়ান্ত আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান সম্বলিত একটি বিশেষ প্রচারপত্র প্রকাশ এবং প্রচার করে ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫১। উক্ত প্রচারপত্রে আহ্বান জানিয়ে বলা হয় :

... ... আপনারা এই মহৎ কর্তব্যে এগিয়ে আসুন। জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিন বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে পাকিস্তানের কত অনিষ্ট করা হবে। আমরা পাকিস্তানের অনিষ্ট চাই না। তাই যারা অনিষ্ট করতে চায় তারা যাতে মিথ্যা প্ররোচণা ও ধর্মের দোহাই দিয়ে তা করতে না পারে তার ব্যবস্থা করুন এবং তা করা তখনই সম্ভব যখন আমরা সংগঠিত হব। আজ সংগঠনের আশু প্রয়োজন। বন্ধুগণ, আপনাদের স্থানীয় এলাকায় সংগঠন করুন ও স্থানীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি স্থাপন করে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করুন। আন্দোলনকে জয়যুক্ত করে পাকিস্তানকে শক্তিশালী করুন।[৩৫]

১৯৫১ : বুদ্ধিবৃত্তিক বাদ-প্রতিবাদের বছর

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে উর্দু-বাংলা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই পার হয়েছে ১৯৫১ সাল। ইত্তেফাক, নওবেলাল, পাকিস্তান অবজারভার ভূমিকা পালন করে বাংলা ভাষার পক্ষে। আবার বিপক্ষের কাগজও সংখ্যায় কম ছিল না। এ বছর ১৫ এপ্রিল করাচিতে অনুষ্ঠিত উর্দু সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুল রহমান এবং মওলানা আকরাম খাঁ উর্দুর পক্ষে এবং বাংলার বিপক্ষে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেন। নতুন কিছু নয়, তাদের বাংলাবিরোধী ভূমিকা সবারই জানা। পাকিস্তান অবজারভার তাদের এই ন্যক্কারজনক ভূমিকার বিরুদ্ধে কড়া সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে মাওলানা আকরাম খাঁ প্রচণ্ড খাপ্পা হয়ে উর্দু সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেন—'পূর্ববঙ্গে যারা উর্দুর বিরোধিতা করে, তারা ইসলামের শত্রু। বক্তব্যের সূত্রধরে অবজারভার সে সময় প্রশ্ন তোলে—তবে কি ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতো পণ্ডিতও ইসলামের শত্রু?

মাতৃভাষার প্রতি ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর শ্রদ্ধা শুধু ভক্তিপূর্ণই ছিল না, ছিল যুক্তিপূর্ণও। এ বছর ১৬ মার্চ কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্মেলনে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন,—'বাংলা ভাষা অবহেলিত হইলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রোহ করিব।'

বায়ান্নো : বাতাস বয়ে আনে স্ফুলিঙ্গকণা

ভাষা আন্দোলনের কথা উঠলেই চলে আসে বায়ান্নোর কথা। ১৯৫২ সাল। ২১ ফেব্রুয়ারি। ফাল্গুনের আট। পলাশ রাঙা শিমুল রাঙা একুশ। ছেলেহারা শতহারা মায়ের অশ্রুভেজা বায়ান্নোর ফেব্রুয়ারি। আমার ভাইয়ের রক্তরাঙানো

... আরো কত কী! গাণিতিক নিয়মে একান্নোর পরেই বায়ান্নো আসে বটে। কিন্তু বাঙালির বায়ান্নো একটু অন্য রকম। বায়ান্নোতে যে মহীরূহ দেখে সবাই চমকে ওঠে, তার বীজ উপ্ত ছিল বহু পেছনে। সেই কবে চর্যাগাওয়া বাঙালিরা শুরু করেছিল ভাষার লড়াই, যুগান্তরের নানাবিধ বাধার পাহাড় পেরিয়ে তবেই এই ১৯৫২-তে আসা। সত্যি বটে বাংলা ভাষার পথে পথে ছিল পাথর ছড়ানো কাঁটা বিছানো। অসংখ্য কাঁটার আঘাত সয়েই বাঙালি এই বায়ান্নোতে এসে ফুটিয়েছে ভাষার কুসুম।

বায়ান্নো সালের জন্যে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পটভূমি রচনা করে পূর্ববঙ্গের ছাত্র যুবক দামাল ছেলেরা। পাকিস্তান সৃষ্টির আগে থেকেই পাকিস্তানের সম্ভাব্য 'রাষ্ট্রভাষা' নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক আর চক্রান্ত। শুরু থেকেই বাঙালি এ চক্রান্তের মোকাবিলা করে আসছে। 'রাষ্ট্রভাষা' নিয়ে পাকিস্তানি শাসকদের অসঙ্গত, অযৌক্তিক ও উদ্ধত মনোভাবের কারণে ছাত্রসমাজে অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি হয়। সে পরিবেশ ছিল শুকনো বারুদের মতো। সেখানে দরকার ছিল একটি স্ফুলিঙ্গ বা আগুনের কণা। আর পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তার অদূরদর্শী ভাষণে ঐ স্ফুলিঙ্গটি যোগ করেছিলেন উত্তেজিত ছাত্র চেতনার শুকনো বারুদের স্তূপে।'[৩৬]

আবারো খাজা নাজিমউদ্দিন

নিয়তির কী যে পরিহাস—রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের আলোর ফোকাস আবারো বঙ্গসন্তান খাজা নাজিমউদ্দিনের উপরে। এ আন্দোলনের সূচনাপর্বে অর্থাৎ ১৯৪৭-'৪৮-এ তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গ নামের প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। বিস্তর দালালি করলেন বাংলার বিপক্ষে, উর্দুর পক্ষে। পুরস্কার পেলেন হাতে নাতে। ডাবল প্রমোশন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর (১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮) মৃত্যুর পর তিনি ছিলেন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮। দ্বিতীয় দফায়, লিয়াকত আলী খানের মৃত্যু (১৬ অক্টোবর ১৯৫১) হলে তিনি হলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। ভাগ্য খোলা বলে কাকে! পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে আপন জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে গড়ে ওঠা ভাষা আন্দোলন ১৯৪৮ সালে বেশ তুঙ্গে ওঠে। তখন নাজিমউদ্দিন পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। প্রবল আন্দোলনের মুখে তাঁকে সেবার নতি স্বীকার করতে হয়; ছাত্রদের সঙ্গে আপোষ চুক্তি করতে হয়। তারপর সেই চুক্তিভঙ্গের মতো বিশ্বাসঘাতকতা তিনি করেছেন। সারা পাকিস্তানের মাথায় উঠে বসেছেন। সারা দেশের প্রধানমন্ত্রী বলে কথা। শেষ পর্যন্ত ১৯৫২ সালে

আমাদের ভাষা আন্দোলন সর্বোচ্চ বেগবান হয়ে ওঠে তাঁরই ভাষণের সূত্র ধরে।

১৯৫২ সালের ২৪-২৬ জানুয়ারি পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন ঢাকায়। এ উপলক্ষে ১০ দিনের সফরে পূর্ববঙ্গে আসেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন। তিনি তো এই ঢাকায়ই মানুষ। ২৭ জানুয়ারি পল্টনের জনসভায় আবেগ ভরে দেড় ঘণ্টা ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণে বেফাঁস দুটো মন্তব্য করেই গোল বাধালেন। তিনি বলেন : ১. পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হচ্ছে উর্দু, ২. আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রচেষ্টা যথেষ্ট সফল হচ্ছে।

দুটো কথা-ই মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সেদিনের বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজে, এ দেশের গণমানসে। একেবারে বারুদ জ্বলে ওঠা যাকে বলে তাই। বলা যায় চলমান ভাষা আন্দোলন ঠিক এখান থেকেই বাঁক বদল করে, সর্বব্যপ্ত রূপ ধারণ করে। কেবলমাত্র ছাত্রসমাজের আন্দোলন আর নয়, এবার এ প্রবাহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুক্ত হলো সর্বস্তরের জনসাধারণও। সৃষ্টি হলো অভূতপূর্ব গণজোয়ার, বিপুল তরঙ্গ উচ্ছ্বাস।

এই পর্যায়ে এসে ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিনের অভিমত হচ্ছে– ধর্মের দোহাই, পাকিস্তানের ঐক্যের জিগির, প্রাদেশিক সরকারের প্রতিশ্রুতি, কেন্দ্রীয় সরকারের ও সকল নেতার প্রচেষ্টা, আরবি হরফের জাদুমন্ত্র ব্যবহারের প্রচেষ্টা—এই সব কিছুই বাঙালি জাতির প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও আন্দোলনের প্রবল স্রোতে খড়কুটোর মতোই ভেসে যেতে থাকে এবং শাসক গোষ্ঠী যথার্থই দিশেহারা হয়ে পড়ে। নাজিমউদ্দিনের ২৭ জানুয়ারির বক্তৃতার পর থেকে গোটা ফেব্রুয়ারি জুড়ে অতি দ্রুত একের পর এক এত ঘটনা ঘটে যেতে থাকে, সে সব ঘটনা নিয়ন্ত্রণের কোনো ক্ষমতাই তখনকার জনবিচ্ছিন্ন সরকারের ছিল না। বস্তুতপক্ষে সেদিন আন্দোলন যারা করেছে, তারাই আবার জনজীবনের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষায়ও সচেষ্ট থেকেছে। সেই সময়ের অগ্নিঝরা ঘটনাপ্রবাহের খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা তুলে ধরছি মাত্র।

২৯ জানুয়ারি : প্রথম প্রতিবাদ সভা

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের ২৭ তারিখের পল্টন-বক্তৃতার খবর পরদিন ২৮ জানুয়ারি খবরের কাগজে ছাপা হলে পূর্ববাংলার প্রায় সব জায়গাতেই বিক্ষোভ তৈরি হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ ফুঁসে ওঠে;

কিন্তু প্রতিবাদের বিস্ফোরণ ঘটে ২৯ জানুয়ারি। এ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। স্লোগান ওঠে—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, নাজিমউদ্দিন গদি ছাড়ো। নাজিমউদ্দিন-নুরুল আমিন ভাই ভাই, গদি ছাড়ো রক্ষা নাই ইত্যাদি। ময়মনসিংহের নূরুল আমিন তখন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী। গদি রক্ষার গরজে বাঙালি হয়েও তিনি বাংলা ভাষার বিপক্ষে দাঁড়ান, দাঁড়ান নাজিমউদ্দিনের পক্ষে। ২৭ জানুয়ারির জনসভায় তিনি ছিলেন সভাপতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি এ দিন ব্যাপক পোস্টারিং করে। নাজিমউদ্দিনের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে। ৩০ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতীকী ধর্মঘট আহ্বান করে।

২. অলি আহাদের বিবৃতি

'ঐ দিনই (২৯ জানুয়ারি) পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ যুবলীগের পক্ষ থেকে নাজিমউদ্দিনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন।' ... ঐ বিবৃতিতে জনাব অলি আহাদ আরো বলেন, 'আমরা আমাদের সকল ইউনিটকে বিশেষভাবে এবং জনগণকে সাধারণভাবে আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে তাঁরা এর নিন্দা করেন। আমরা এই সঙ্গে আবেদন জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির প্রতি, যাতে তারা এই প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে। (পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি—বদরুদ্দীন উমর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২০-২১)

৩০ জানুয়ারি : ধর্মঘট-মিছিল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কমিটির আহ্বানে ৩০ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। কেউ কেউ একে প্রতীক ধর্মঘটও বলেন। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীরা দুপুরের দিকে আমতলায় মিলিত হয়ে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা খালেক নওয়াজ খান। বক্তারা সবাই ২৭ তারিখের পল্টন সভায় প্রদত্ত নাজিমউদ্দিনের বাংলাবিরোধী বক্তৃতার তীব্র নিন্দা জানান। বরং পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে বাংলাকে পূর্ববঙ্গের সরকারি ভাষা ঘোষণার যে চুক্তি তিনি সম্পাদন করেন, দেরিতে হলেও এখনই তা বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

সভা শেষে বিরাট এক প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। ছাত্র মিছিলের সঙ্গে খুব সহজে যুক্ত হয় অন্যান্য শ্রেণী পেশার মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুক্ত হয়, আওয়াজ তোলে—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, নাজিমউদ্দিনের পদত্যাগ চাই, ইত্যাদি। ফুলার রোড হয়ে ঘুরে বর্ধমান হাউসে প্রধানমন্ত্রী (পূর্ব বাংলা)-র সরকারি বাসভবনের সামনে থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত গিয়ে এ বিশাল মিছিল শেষ হয়। মিছিল শেষে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়—৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রধর্মঘট।

এদিন মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের সভায় চলমান ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের পাশাপাশি আওয়ামী মুসলিম লীগেরও সরাসরি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়।

৩১ জানুয়ারি : সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে ৩১ জানুয়ারি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে পূর্ববাংলার সকল রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। ঐ বক্তব্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয় এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পূর্বপ্রতিশ্রুতি পালনের আহ্বান জানানো হয়। এই সম্মেলন থেকেই কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে ৪২ সদস্যের সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান, শামসুল হক, আবুল হাশিম, আবুল কাশেম, কামরুদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, শামসুল হক চৌধুরী, মীর্জা গোলাম হাফিজ, আব্দুল মতিন—প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এ কমিটির সদস্য হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির ঘোষিত ৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্রধর্মঘট কর্মসূচির প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। অত্র পরিষদ সেই সঙ্গে ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ববাংলায় (পূর্ব পাকিস্তানে) সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে।

৩১ জানুয়ারির এই সম্মেলন থেকে সদ্যগঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবগুলো ছিল :

১. বিভিন্ন রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এই সভা ১৯৪৮ সালে পূর্বপাকিস্তানের ছাত্র জনগণের সহিত নিজের চুক্তির লঙ্ঘন করিয়া প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন উর্দুকে

একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলিয়া সম্প্রতি ঢাকায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও নিন্দা ব্যক্ত করিতেছে।' 'সেই হিসেবে এই সভা খাজা নাজিমউদ্দিনকে তাঁহার অগণতান্ত্রিক ও অযাচিত ঘোষণা প্রত্যাহার করিবার জন্য দাবি জানাইতেছে।'

২. 'বাংলা ভাষাকে হত্যার আর একটি চক্রান্ত হিসেবে বাংলায় আরবি অক্ষর প্রচলনের জন্য এই সভা সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে।'

৩. 'ঢাকা শহরে ৪ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট করিবার যে সিদ্ধান্ত ঢাকার ছাত্ররা গ্রহণ করিয়াছে এই সভা তাহার প্রতি সমর্থন জানাইতেছে।'

৪. 'এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা হইবে পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু জনসাধারণের ভাষা; আর পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণ যদি উর্দুকে তাহাদের সাধারণ ভাষা বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে উর্দুও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হইবে।'

৫. 'এই সভা অবিলম্বে নিরাপত্তা বন্দী শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আটক বন্দীর মুক্তি এবং জননিরাপত্তা আইন প্রত্যাহারের দাবি জানাইতেছে।'

৩ ফেব্রুয়ারি : নাজিমউদ্দিনের সংবাদ সম্মেলন

কথায় বলে গরজ বড় বালাই। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন বঙ্গসন্তান বলেই বাংলার মানুষের মানসিকতা খানিকটা বুঝতে পারেন। ২৭ জানুয়ারি পল্টন বক্তৃতায় যা বলার বলেছেন। হাতের তীর আর মুখের কথা বেরিয়ে গেলে কি ফেরানো যায়? যায় না হয়তো, তবুও অনেক সময় সে চেষ্টাও করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গা ঘুরতে গিয়ে টের পান—তাঁর ২৭ জানুয়ারির বক্তব্যে বাঙালিরা কতটা ক্ষিপ্ত হয়েছে। ঢাকায় ফিরেই ৩ ফেব্রুয়ারি সংবাদ সম্মেলন ডেকে নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে সেদিন তিনি নিজের কোনো মতামত দেননি, কায়দে আজমের মতামত প্রকাশ করেছেন মাত্র। একেই বলে—'ঠাকুর ঘরে কেরে? আমি কলা খাইনি।'

৪ ফেব্রুয়ারি : চূড়ান্ত আন্দোলনের রিহার্সেল

প্রথমে শুধু ঢাকার কথা-ই ভাবা হয়েছিল।

৩০ জানুয়ারির প্রতিবাদ সভা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ঘোষণা দেয় ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্মঘট। ৩১ জানুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে সেই ফোরাম থেকেও ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকাকেন্দ্রিক এই কর্মসূচিকে সর্বাত্মক সমর্থন জানায়। কিন্তু ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পৌঁছানোর পর বুঝা গেল—আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছে গেছে মফস্বলের জেলা বা মহকুমা শহরে, এমন কি প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে পর্যন্ত সে ঢেউ আছড়ে পড়েছে। যাদের নেতৃত্বে এ আন্দোলন গড়ে উঠেছে তাদের অনেকেই ধরতেই পারেনি—ছাত্র আন্দোলন কখন কীভাবে গণআন্দোলনে রূপ নিয়েছে, বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার দায় কখন গণমানুষ স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছে। বস্তুতপক্ষে সুসংগঠিতভাবে কেন্দ্র থেকে কোনো নির্দেশও পাঠানো হয়নি দূর মফস্বলে। তবু ঢাকায় বারুদ জ্বলে উঠতে না উঠতেই সে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র, সারাদেশে। যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল গোটা পূর্ববাংলা। ২১ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত লড়াই হবার আগে এ যেন শেষ রিহার্সেল। তাই ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তো বটেই, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট পালিত হয় এবং বিক্ষোভ-মিছিলও বের হয় দেশের প্রায় সকল শহরে, এমনকি গ্রামেও। এভাবেই, ২১ ফেব্রুয়ারির আগেই আমাদের ভাষা আন্দোলন গণআন্দোলনের চারিত্র্য লাভ করে।

৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রধর্মঘট সম্পূর্ণ সফল হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও নগরীর সমস্ত স্কুল-কলেজ এই কর্মসূচি পালন করে। তবু এটা ছাত্রদের কর্মসূচিতেই থেকে যায়। কিন্তু বিক্ষোভ-মিছিল আর শুধু ছাত্র কর্মসূচিতে আবদ্ধ থাকে না, মিছিলে অংশগ্রহণ করে অনেক অ-ছাত্র, সাধারণ মানুষও। মিছিল শেষে বিপুলসংখ্যক ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। বিরাট সেই ছাত্রসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ভাষাসৈনিক গাজীউল হক। এই সমাবেশ থেকে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কমিটি'কে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি অঙ্গসংগঠন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারির এই সভাতেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সারা পূর্ববাংলায় ২১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। এরপর একুশের ভোর পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ চলতেই থাকে। আত্মপরিচয়ের শেকড়ের সন্ধানে বাঙালি জাতির ঘুরে দাঁড়াবার একুশ, প্রস্তুতি তো তার লাগবেই।

১১-১২ ফেব্রুয়ারি : আবার পতাকা দিবস

একুশে ফেব্রুয়ারির বিস্তারিত কর্মসূচি নিয়ে বিশদ আলোচনা হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৪ ফেব্রুয়ারির সভায়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বিস্তারিত আন্দোলন-কর্মসূচি পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সেই লক্ষ্যেই ১১-১২ ফেব্রুয়ারি দুদিনব্যাপী পতাকা দিবস পালনেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পতাকা-দিবসের পতাকা মানে সেই আগের মতোই ছোট ছোট কাগজে ছাপা পতাকা এক দিকে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' লেখা, অন্যদিকে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। সচিবালয়ের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারী কিংবা পথচারির হাতে পতাকা ধরিয়ে দিয়ে অর্থসহযোগিতার প্রস্তাব দেয়া। শুধু অর্থ সহযোগিতাই নয়, এ হচ্ছে আন্দোলনকে অনেক মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার একটি প্রক্রিয়া। যারা অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে, তারা আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতাও অনুভব করে, সহমর্মিতা জানায়। এভাবেই একুশের আন্দোলন হয়ে ওঠে সকলের আন্দোলন।

১৬ ফেব্রুয়ারি : রাষ্ট্রভাষার দাবিতে অনশন ধর্মঘট

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সচেতন ছাত্রসমাজের সূচিত আন্দোলন যখন প্রায় গণমানুষের আন্দোলনে রূপ নেয়ার পথে, শেখ মুজিব তখন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে, নিরাপত্তা আইনে বন্দি। জেলখানা থেকেই তিনি বাঙালির আত্মজাগরণের এই মহৎ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে চাইলেন। সহবন্দি এবং রাজনৈতিক সতীর্থ মহিউদ্দিন আহমদকে সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তিনি অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। তখন ঢাকা জেলখানা থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আন্দোলনরত ছাত্রনেতাদের অনেকেই সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। চলমান আন্দোলনের বিষয়ে আলাপ-পরামর্শ হয়। এসব দেখে শুনে কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবকে ঢাকা জেল থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি স্থানান্তর করে ফরিদপুর জেল-এ। 'তিনি তখনো অনশন করে যাচ্ছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি তিনি ফরিদপুর জেলে কড়া পাহারায় বন্দী ছিলেন। তখন তাঁর শরীর সাংঘাতিকভাবে ভেঙে পড়েছে। অবশেষে তাঁর শারীরিক অবস্থার অস্বাভাবিক অবনতি ঘটলে তাঁকে ২৬ ফেব্রুয়ারি মুক্তি দেয়া হয়।'[৩৭]

২০ ফেব্রুয়ারি : ১৪৪ ধারা জারি

ফেব্রুয়ারির একুশে সারা পূর্ববঙ্গে প্রতিবাদ কর্মসূচি সফল করে তোলার উদ্দেশে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কমিটি এবং অন্যান্য ছাত্র ও যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলে দেশের প্রধান প্রধান শহরের ছাত্রনেতা ও ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে। আন্দোলন পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্যে অর্থসংগ্রহ, পতাকা দিবসের তোড়জোড়। শুধু ঢাকাতেই নয়; রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংসহ বিভিন্ন শহরে একুশের কর্মসূচি বাস্তবায়নে নানামুখী তৎপরতা দেখা যায় ছাত্রদের মধ্যে এবং রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের মধ্যেও।

এত সব তোড়জোড় দেখে শুনে সরকারের মাথা কি ঠিক থাকে! সরকার মানে সারা পাকিস্তানের কেন্দ্রে আছে খাজা নাজিমউদ্দিনের সরকার—এদিকে পূর্ববঙ্গে প্রাদেশিক সরকারের প্রধান মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন। তাদের হাতে মুঠোভর্তি ক্ষমতা। পুলিশ-মিলিটারি সব তাদের হাতে। ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করতে কতক্ষণ! ঢাকায় বড় বড় সরকারি পদে চাকরি করে অবাঙালি অফিসারেরা। তারাও নূরুল আমিন সরকারের কানে দেয় কুমন্ত্রণা। ফলে ধর্মঘট, মিটিং, মিছিল—ছাত্রদের এসব বাড়াবাড়ি থামিয়ে দেয়ার জন্য কঠোর পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। হরতাল-মিছিল-সভা কিছুই চলবে না। সব বন্ধ। সরকার ১৪৪ ধারা জারির সিদ্ধান্ত নেয়। ঢাকার জেলাপ্রশাসক হুসেন হায়দার আইনের এই কঠোর ধারাটি জারি করতে আপত্তি জানালে অতিদ্রুত তাঁকে বদলি করে নতুন জেলাপ্রশাসক এএইচ কোরাইশীকে আনা হলো। সরকারি কর্মকর্তা হয়েও হুসেন হায়দার যে ঝুঁকি নিয়েছেন, সে এক দুঃসাহস বটে। কোরাইশী এসে সরকারের ইচ্ছে পূরণ করেন, জারি করেন আইনের ১৪০ ধারা। মিছিল-মিটিং বন্ধ। ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে পরবর্তী এক মাস ও সব কিছুই চলবে না। এমন কি একসঙ্গে ৫ জনের বেশি লোক হাঁটাও যাবে না।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের জরুরি সভা

ঘোড়াগাড়িতে মাইক বেঁধে সরকারি ঘোষণা প্রচার চলছে '.... ঢাকা শহরের সমগ্র এলাকায় আমার লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ থেকে তিরিশ দিনের জন্য এই ধরনের সকল জনসভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করছি।' প্রায় একই রকম ঘোষণা রেডিও থেকেও প্রচার হচ্ছে। ভাষা আন্দোলনকারী ছাত্র সমাজ খুব ভালো জানে ১৪৪ ধারা কাকে

বলে। তাও কিনা এক মাসের জন্যে। ছাত্ররা মানবে কেন এই কালো আইন? ভয়-ডর বলে কিছু আছে নাকি তাদের? ২০ তারিখে সন্ধ্যায় আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের জরুরি সভা শুরু হয়।

এই সংগ্রাম পরিষদ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলন কর্মসূচি দিয়েছিল যে কারণে তা হচ্ছে—২০ এ ফেব্রুয়ারি থেকে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার দিন ধার্য ছিল। সংগ্রাম পরিষদের পরিকল্পনা ছিল—পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ববাংলা ধর্মঘটে অচল করে দিয়ে আইন পরিষদ ঘেরাও করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণার চাপ দিলে হয়তো কাজ হতে পারে, আইন পরিষদের সদস্যগণ যুক্তিপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করতে পারেন, সুষ্ঠু আলোচনা করতে পারে, এমনকি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষার দাবি বিলম্বে হলেও আলোচনার পর মেনে নিতেও পারেন। সেই জন্যই ২১ তারিখের কর্মসূচি। কিন্তু সরকারি এক ঘোষণায় সব কর্মসূচি সব আয়োজন বন্ধ হয়ে যাবে! ছাত্রসমাজ তাই কিছুতেই মানতে পারে? তাহলে আর এতদিনের ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের মানে কী! নাহ, ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় জরুরি মিটিংয়ে বসে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। সেদিন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে একটিমাত্র প্রসঙ্গ—সরকার যে ১৪৪ ধারা জারি করেছে, তা আগামীকাল ভঙ্গ করা হবে নাকি হবে না?

এ প্রসঙ্গে যুক্তি আছে উভয় পক্ষেই।

রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই চলে গেলেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার বিপক্ষে। ১৪৪ ধারা ভাঙলেই ওরা পাখি মারার মতো করে গুলি ছুঁড়ে মানুষ মারবে। টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে মানুষজনকে ছত্রভঙ্গ করে দেবে। কোন মায়ের যে বুক খালি হবে, তার কি ঠিক ঠিকানা আছে। ১৪৪ ধারা ভাঙবার এ সিদ্ধান্ত হবে আত্মঘাতী হঠকারী সিদ্ধান্ত। সামনেই জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাবনা। একটা ছলছুতো ধরে যদি পানি ঘোলা করা হয় এবং সেই অজুহাতে নির্বাচন বন্ধ করে অথবা পিছিয়ে দেয়া হয়! সেটা কি বড় ক্ষতি হয়ে যাবে না! নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় গেলে তো বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা অনেক সহজ হয়ে যাবে। কাজেই এখন পাষাণে মাথা না কুটে, আপাতত নিজের মাথা রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এ পক্ষে ছিলেন আবুল হাশিম, শামসুল হক, কামরুদ্দিন আহমদ, খায়রাত হোসেন, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ।

এদিকে ছাত্ররা অতো ক্ষমতার হিসেব বোঝে না। তাদের বুদ্ধি আছে ঠিকই, অতো ঘোরপ্যাঁচের চালাকি বোঝে না। সোজা কথা সোজা করে

বোঝে। এই ১৪৪ ধারা মেনে নিলে ওরা ঘাড়ে চেপে বসবে। আর কখনো আন্দোলনে নামতে দেবে না। আন্দোলন করেই দাবি আদায় করতে হবে। দেশের সাধারণ মানুষ সেটাই দেখতে চায়। প্রয়োজনে তারাও যোগ দেবে এই আন্দোলনে। জয়-পরাজয় যা-ই হোক, এই চূড়ান্ত মুহূর্তে আন্দোলন ছেড়ে পিছিয়ে আসার কোনো মানেই হয় না। পিছিয়ে আসার কোনো সুযোগই নেই। আন্দোলন থেকে ছাত্ররা পিছিয়ে এলে জনগণ আর ভরসার জায়গা খুঁজে পাবে না, হতাশায় ডুবে মরবে। ভবিষ্যতে ছাত্রদেরও আর বিশ্বাস করবে না। কাজেই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে হলেও আন্দোলনেই মুক্তি। এই যুক্তির পক্ষে অর্থাৎ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে প্রধানত গোঁ ধরে থাকেন আব্দুল মতিন এবং অলি আহাদ। যুক্তি-পাল্টা যুক্তি এবং তর্ক বিতর্ক শেষ পর্যন্ত সমাধান দিতে পারছে না দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্যে ২০ ফেব্রুয়ারি ভোটাভুটিতে যেতে হয়। কিন্তু তাতেই বা সমাধান হলো কই! ১১ জন গেল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে। আর ৩ জন (আবদুল মতিনের মতে ৪ জন) গেল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে। এরাই মূলত ছাত্র ও যুবশক্তির প্রতিনিধি। সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়েও এরা জানালেন—এখানকার এই সংখ্যার জোরে আন্দোলন থামিয়ে দেয়া যাবে না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগামীকাল সকালে, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিং প্রাঙ্গণে আমতলার ছাত্র জমায়েতে উপস্থিত ছাত্র সাধারণই ঠিক করে দেবে—১৪৪ ধারা ভাঙা হবে। কিংবা হবে না।

২০ ফেব্রুয়ারি সভা এভাবেই এক প্রকার সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যে শেষ হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বেশ খানিকটা বিমূঢ় হয়ে পড়ে সেই পরিস্থিতিতে। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে দ্বিধা-সংশয় নেই, তাদের চোখে মুখে ভয়ভীতির লেশমাত্র ছাপ নেই। তারা সেই রাতেই বিভিন্ন ছাত্রাবাসে ছড়িয়ে পড়ে, একুশের কর্মসূচি ছড়িয়ে দেয়, নানা ধরনের প্রস্তুতি আর উৎকণ্ঠায় রাতের প্রহর পার হয়। এগিয়ে আসে একুশের সূর্যদয়।

অমর একুশে : নতুন সকাল

এ সকাল একেবারে অন্যরকম। শেষ ফেব্রুয়ারির শীত-আচ্ছন্ন আবহাওয়া। গাছের পাতা থেকে টুপটাপ ঝরছে শিশির। তবু এরই মাঝে সাধারণ ছাত্রদের উত্তেজনার শেষ নেই। সত্যি বলতে গেলে গত রাতটাই তাদের কেটেছে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে ফুটতে—১৪৪ ধারা ভাঙতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। রাত ভোর হয়েছে, প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ় হয়েছে। কুয়াশার

চাদর সরিয়ে সকালের আলো ফুটতেই ছাত্রেরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এসে ছোট ছোট গ্রুপে প্রবেশ করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। সকাল নটার মধ্যে সবাই সমবেত হয় আমতলায়। কেউ কেউ বলেন বেলতলা। বর্তমানে সেই জায়গাটা পড়েছে মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে।

ওদিকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরের রাস্তায় পুলিশবাহিনী অবস্থান নিয়েছে সকাল সাড়ে সাতটা থেকেই। কারো হাতে লাঠিসোটা, কারো হাতে রাইফেল-বন্দুক, মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র। তাদের পাশেই সাদা পোশাকের লোকও বেশ কয়েকজন। এক পাশে জিপ, পুলিশের পিকআপ ভ্যান, ট্রাক। নিরস্ত্র ছাত্রদের বিরুদ্ধে সরকারের সে কী সশস্ত্র প্রস্তুতি!

আমতলার সভা

সকাল ১০টার মধ্যে কানায় কানায় ভরে যায় আমতলা। বিশাল ছাত্র জমায়েত। দশটার পরপরই শুরু হয় সভা। সভাপতিত্ব করেন গাজীউল হক। প্রথমেই বক্তব্য রাখেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক। তিনি গতরাতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের জরুরি সভায়

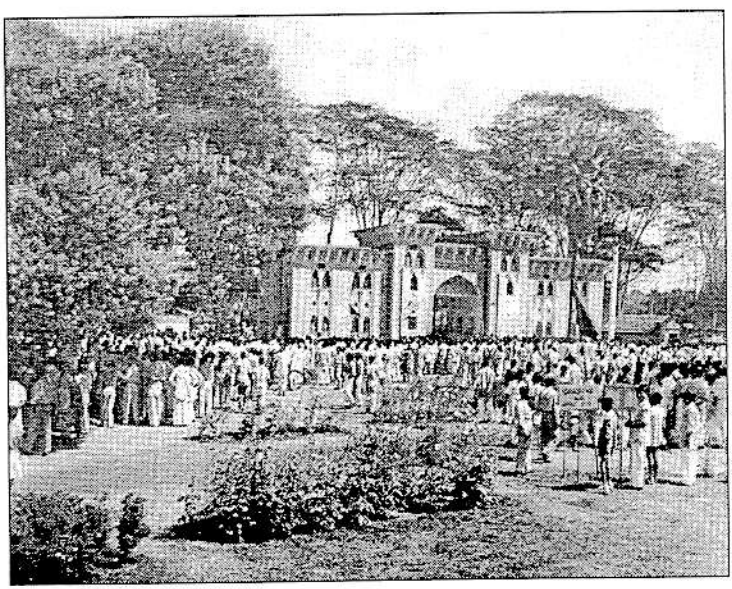

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। আমতলা গেটের সামনে মিটিং

সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অভিমতটি তুলে ধরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু সাধারণ ছাত্রদের উত্তেজনা-প্রতিবাদ আর লাগাতার স্লোগানে তার বক্তব্য চাপা পড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক আব্দুল মতিন ১৪৪ ধারা ভেঙে নির্ধারিত কর্মসূচি পালনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। এটাই ছিল ছাত্রদের প্রাণের কথা। এমন বক্তব্যই তারা আশা করছিল। উত্তেজিত ছাত্ররা স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে তোলে সেদিনের সমাবেশ। এরপর আর কারো বুঝতে বাকি থাকে না—এখন কী করণীয়। কর্মসূচি তো আগে থেকেই ঠিক করা আছে—বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল বেরিয়ে এগিয়ে যাবে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ (পার্লামেন্ট) অভিমুখে। এই আইন পরিষদ সভা মানে অ্যাসেম্বলি ভবন তখন ছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেই। জগন্নাথ হলের পাশেই। এটাকে প্রাদেশিক পরিষদ ভবনও বলা হতো। সেই পরিষদ ভবন ঘেরাও করে পরিষদের সদস্যদের কাছে দাবি জানাবে—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, খাজা নাজিমউদ্দিনের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির বাস্তবায়ন চাই, উর্দুর দখলদারিত্ব চাই না। শান্তিপূর্ণ এই কর্মসূচির কোথাও মারামারি কাটাকাটির জায়গা নেই। তবু সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেই অকারণে সৃষ্টি করে উত্তেজনা। বলতে গেলে পিকেটিং ছাড়াই পালিত হয় সর্বাত্মক ধর্মঘট। শান্তিভঙ্গের ঘটনা তো ঘটেনি কোথাও! বরং সরকার ঘোষিত ১৪৪ ধারাই তো শান্তিভঙ্গের কারণ ঘটায়। বাধা দিলে বাধবে লড়াই এ তো সোজা কথা। ছাত্ররা তাদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি তো পালন করবেই। ঠিক করা হয় ১০ জনের এক একটি দলে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত বিভক্ত হয়ে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে বেরুবে। লক্ষ্য তাদের অ্যাসেম্বলি ভবন। এভাবেই চলবে মিছিল।

এগিয়ে চলে জয়ের নেশায়

একুশ মানেই মাথা না নোয়ানো—'উন্নত মম শির'। একুশ মানেই সামনে এগিয়ে চলা, সব বাধা পায়ে ঠেলে। একুশের কর্মসূচি অনুযায়ী ১০ জনের প্রথম গ্রুপটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে হাবিবুর রহমান শেলী এবং আজমল হোসেনের নেতৃত্বে।

এরপর ১৪৪ ধারা ভেঙে দ্বিতীয় দলটি রাস্তায় নেমে আসে আব্দুস সামাদ, ইব্রাহিম তাহা, আনোয়ারুল হক খান মজলিশ ও আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর নেতৃত্বে। এভাবে ১০ জনের দল বেরোতেই থাকে। মুখে তাদের খই-ফোটা স্লোগান—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। শুধু ছাত্র কেন ছাত্রীরাও পিছিয়ে থাকার পাত্রী

নয়। শাফিয়া খাতুন, সুফিয়া ইব্রাহিম, রওশন আরা বাচ্চু, শামসুন্নাহারের নেতৃত্বে ছাত্রীরাও বেরিয়ে পড়ে মিছিলে। এমনিভাবে চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুনো মাত্র পুলিশ তাদের আটক করে, ভ্যানে কিংবা ট্রাকে ভরে, তারপর নিয়ে যায় নিরাপত্তা হেফাজতে। কেউ কেউ পাশ কাটিয়ে ছুটে সামনের রাস্তা ধরে এগিয়ে যায়। প্রথমে শৃঙ্খলা থাকলেও খানিক পরে একসঙ্গে এত ছাত্র রাস্তায় বেরিয়ে আসে যে পুলিশের পক্ষে তা সামাল দেয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। তখন ছাত্রদের ঠেকাতে পুলিশ তাদের উপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢুকে টিয়ার গ্যাস-সেল ছোঁড়ে। টিয়ার গ্যাস মানে কাঁদানে গ্যাস। সম্ভবত ঢাকায় সেই প্রথম কাঁদানে গ্যাসের ব্যবহার। লাঠি ও কাঁদানে গ্যাসের অত্যাচারে ছাত্রদের অনেকেই বিভিন্ন পথে মেডিকেল হোস্টেলের দিকে যেতে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য, এখানে জমায়েত হয়ে পরিষদ ভবনের (এ্যাসেম্বলি) সামনে পৌঁছানো। তাদের অন্তরে মন্দ্রিত বাণী—মোরা ভয় করব না ভয় করব না ....।

ছোট্ট বন্ধুরা, সেদিনের এই ১০ জনের গ্রুপের সবার নাম তো উল্লেখ করা গেল না, তবে তোমরা জেনে আনন্দ পাবে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো চিরভাস্কর এই নামগুলো খাতার পাতায় সেদিন লিখে রাখার দায়িত্ব পালন করেন হাসান হাফিজুর রহমান এবং মোহাম্মদ সুলতান। তোমরা কি আজ ভাবতে পারো—একুশের আন্দোলন কতটা পরিকল্পিত আন্দোলন ছিল! পুলিশ মিছিলকারীকে গ্রেফতার করছে, ট্রাকে ভরছে, জেলখানায় নিয়ে যাচ্ছে, তবু মিছিল বন্ধ হচ্ছে না। লাঠিচার্জ এবং কাঁদানে গ্যাসে বিপর্যস্ত হয়েও তারা মেডিকেল হোস্টেলে সমবেত হচ্ছে, মিছিল বন্ধ হচ্ছে না। হোস্টেল থেকে সংঘবদ্ধভাবে বেরিয়ে মিছিল করেই তারা পৌঁছুতে চায় অ্যাসেম্বলিতে, আইন পরিষদ ভবনে। এরই মধ্যে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এই মেডিকেল হোস্টেল এলাকায় এসে ফুলার রোডে অবস্থান গ্রহণ করে।

শুধু অবস্থান গ্রহণ নয়, এখানেও তারা আগ্রাসী ভূমিকা পালন করে। মেডিকেল হোস্টেল ক্যাম্পাসের মধ্য থেকে ছাত্রদের বেরিয়ে আসা ঠেকানোর জন্যে আবারো বেপরোয়া লাঠি চালায় এবং কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে দেয়। এ অবস্থায় অল্পবয়সী স্কুল ছাত্ররা পুলিশের দিকে ইটপাটকেল ছুঁড়ে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। এভাবে দুপুর গড়িয়ে যায়, তবু সংঘাত শেষ হয় না। হাল ছাড়তে রাজি নয় কেউই, না ছাত্র না পুলিশ। হোস্টেলের ভেতরে ও বাইরে ছাত্ররা চায় তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে; এ তো ছাত্রদেরই এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এলাকা। এখানে পুলিশ কেন? কী কাজ পুলিশের? সরকারের কড়া

নির্দেশ—ছাত্রদের লাফালাফি বন্ধ করতেই হবে। কাজেই সরকারি মদদেই তারা শক্তিশালী। আর ছাত্ররা শক্তি পায় মানুষের ভালোবাসা থেকে। এ রকম যুদ্ধাবস্থার মধ্যেও বকশিবাজার ও আশপাশ এলাকা থেকে বহু অ-ছাত্র সাধারণ মানুষ হোস্টেলের পিছনের গেট দিয়ে ঢুকে আন্দোলনরত ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে যায়। ক্ষোভ প্রকাশ করে।

অবশেষে চালায় গুলি

প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশন শুরু বিকেল সাড়ে তিনটায়। একুশের কর্মসূচি অনুযায়ী ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং রাষ্ট্রভাষার দাবি জানাবার জন্যে পরিষদ ভবনের দিকে যাবার উদ্যোগ নেয়। পুলিশ তখনই কাঁদানে গ্যাস এবং লাঠিচার্জ করে। ওদিকে বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে সমবেত কিছু ছাত্র রওনা হতে চাইলে এখানেও পুলিশ লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। মেডিকেল হোস্টেলের ভেতরে ঢুকে পুলিশ এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জ শুরু করলে ছাত্ররা ইটপাটকেল ছুঁড়ে আপাতত হটিয়ে দেয় পুলিশ বাহিনীকে। তবে ছাত্র পুলিশের খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষ দফায় দফায় চলতেই থাকে। উত্তেজনা বাড়তেই থাকে সারা দুপুর জুড়ে। তাই বলে গুলি? প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্রদের টার্গেট করে

পাঁচ ভাষা শহীদ
উপরে বাম থেকে : আব্দুস সালাম, শফিউর, আব্দুল জব্বার। নিচে বামে থেকে : রফিক উদ্দিন, আবুল বরকত

গুলি ছুঁড়বার ঘটনা সেই প্রথম ঘটে ঢাকায়। ছাত্ররা নিরস্ত্র, পুলিশ সশস্ত্র। নিরস্ত্রের উপরে অস্ত্র চালনা—বর্বর অসভ্যেরাও করে না। পাকিস্তান সরকারের বর্বর পেটোয়া পুলিশ বাহিনী এক প্রকার বিনা উস্কানিতেই ২১ ফেব্রুয়ারি বেলা সোয়া তিনটার দিকে ছাত্রজনতার উদ্দেশে গুলি চালায়। রাস্তার কোনায় একত্রিত হওয়া ছাত্রজনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে এ হোস্টেল গেটের ভিতরে ঢুকে সমবেত ছাত্রদের লক্ষ্য করে পুলিশ কয়েক দফা গুলি চালায়।

পুলিশের গুলিতে সেদিন (২১ ফেব্রুয়ারি) প্রকৃতপক্ষে কতজন শহীদ হন, কতজন আহত হন তার সঠিক হিসেব এখনো যথাযথভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে বিভিন্ন গবেষকের তথ্য থেকে যতদূর জানা যায়, সেদিন গুলি চলে ২৭ রাউন্ড। নিহত হন ৪ জন। তারা হলেন : আবুল বরকত, আব্দুল জব্বার, সালাহউদ্দিন এবং রফিক উদ্দিন। আহত ১৭ জনের মধ্যে আব্দুস সালাম নামে আরো একজন মারা যান।

মোট শহীদের সংখ্যা ৫ জন। এদের সবার পরিচয়ও স্পষ্ট নয়। যেমন: রফিকউদ্দিনকে ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক বলছেন মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র; গবেষক হায়াৎ মামুদ বলছেন—ঢাকার সাধারণ নাগরিক। আহমদ রফিকের মতে আব্দুল জব্বার গফরগাঁওয়ের কৃষক-যুবা। হায়াৎ মামুদসহ আরো অনেকে আব্দুল জব্বারকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলেছেন। আবার আব্দুস সালামকে ফেনীর বাসিন্দা বলে পরিচয় দেয়ার পর আহমদ রফিক জানাচ্ছেন—তিনি কাজ করতেন সরকারের সচিবালয়ে, থাকতেন নীলক্ষেত ব্যারাকে। অন্যেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেদিন এই পাঁচ জনের বাইরে আরো কয়েকজনের মৃতদেহ পুলিশের ট্রাকে তুলতে দেখেছে প্রত্যক্ষদর্শীরা, দাফন কাফন ছাড়া কোথায় কিভাবে তাদের শেষকৃত্য হয়েছে কেউ জানে না; সেই শহীদদের প্রকৃত নাম পরিচয়ও আজো উদ্ঘাটিত হয়নি।

গবেষক ও পণ্ডিত বদরুদ্দীন উমর সেদিন বিকেল থেকে সন্ধ্যার বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁর বিখ্যাত বই 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'তে উল্লেখ করেছেন :

> গুলিবর্ষণের পর মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ২০ নম্বর শেডের মধ্যে থেকে মাইকে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে এ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা বলে প্রচার কাজ শুরু হয়েছিল। তাছাড়া ঐ সময় গুলিতে হতাহত ছাত্রদের রক্তাক্ত জামাকাপড় তুলে ধরে পুলিশি নির্যাতনের নিদর্শন স্বরূপ সেগুলো সমবেত জনতার সামনে প্রদর্শন করা হচ্ছিল।

পুলিশের গুলিতে এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের খবর অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা শহরে। সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট বাজারঘাট যানবাহন—সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। শোকাচ্ছন্ন মানুষ ভুলে যায় ১৪৪ ধারার কথা। সবাই ছুটে আসে মেডিকেলে শহীদদের এক নজর দেখতে। পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ থেকে বেরিয়ে আসেন মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, আনোয়ারা খাতুন, খয়রাত হোসেন; কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোরঞ্জন ধর, নেলী সেনগুপ্তা প্রমুখ। তাঁরা মেডিকেলে এসে দেখতে পান শহীদদের রক্তেভেজা শার্ট ফেস্টুন হয়ে উড়ছে বাঁশের মাথায়, ১২ ১৩ ১৪ এবং ২০ নম্বর ব্যারাকের গায়ে বুলেটের আঘাতচিহ্ন তখনো স্পষ্ট, শহীদের রক্ত হাতে মেখে হোস্টেল ব্যারাকের দেয়ালে রক্তছাপ এঁকে দিয়েছে ছাত্ররা। পুলিশের এই নারকীয় অনাচারের এইসব আলামত দেখে আবেগে ফেটে পড়েন পরিষদ সদস্যেরা। কান্নায় ভেঙে পড়ে সাধারণ মানুষ।

এদিন সকাল থেকেই ২০ নম্বর ব্যারাকের ১ নম্বর রুমে 'কন্ট্রোলরুম' স্থাপন করে মেডিকেল ছাত্ররা। আন্দোলন কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে মওলানা তর্কবাগীশ এগিয়ে আসেন সেই কন্ট্রোল রুমে। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে আবেগে-উত্তেজনায় তিনি কেঁদে ফেলেন। তিনি পুলিশের এই বর্বরোচিত গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পরিষদ সদস্যদের প্রতি পরিষদ বর্জনের আহ্বান জানান। এমন কি জালিম নুরুল আমিন সরকারের পদত্যাগও দাবি করেন। অথচ ছাত্রহত্যার খবর শুনেও তিনি আহত নিহতদের খোঁজ নিতে আসেননি। এত অনাচার দেখে শুনে মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য আবুল কালাম শামসুদ্দীন ঘৃণাভরে পরিষদ সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন।

সেদিন ঢাকার রাজপথে শুধুই শোকার্ত মানুষ। পায়ে হেঁটে মেডিকেল চত্বরে আসছে, পুলিশি বর্বরতা দেখে চমকে উঠছে, কেউ নীরবে চোখ মুছেছে, কেউ প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে, কন্ট্রোলরুমের মাইক্রোফোনে কান পেতে শুনতে চেয়েছে আগামীকালের কর্মসূচি, সেই কর্মসূচিতে শরিক হবে সবাই। শত সহস্র মানুষের পদভারে কোথায় উড়ে গেছে ১৪৪ ধারা বজ্রআঁটুনি! কে বলেছে—চারজনের বেশি একসঙ্গে হাঁটা যাবে না? সেদিন কে-ই বা মেনেছে খুনি সরকারের এই ঘৃণ্য আইন!

২২ ফেব্রুয়ারি : আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি

পাকিস্তান সরকারের পুলিশ বাহিনী বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে, নির্বিচারে গুলি চালিয়ে মানুষ হত্যা করে বাঙালির রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন

নিস্তব্ধ করে দিতে চাইলেও ফল ফলেছে উল্টো। ছাত্রদের শুরু করা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে সর্বস্তরের মানুষ। তারা বুঝেছে—ব্যাপারটা শুধু ভাষার নয়, জাতিরও। প্রশ্নটা বাঙালি জাতির অস্তিত্বের। ফলে দিনে দিনে রূপ নিয়েছে জাতীয় আন্দোলনে।

১৪৪ ধারা মাথায় করেই মানুষ নেমেছে রাজপথে, এসেছে ঢাকা মেডিকেলে, পুলিশি বর্বরতা দেখে ফুঁসে উঠেছে; অতপর নিজ দায়িত্বেই কন্ট্রোল রুম থেকে জানতে চেয়েছে—কাল কী হবে, আগামীকাল কী কর্মসূচি সংগ্রাম পরিষদের? সেই কর্মসূচিতে সবাই যুক্ত হতে চায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কোনো পিকেটিং নয়, স্বেচ্ছায় যোগ দেবে মানুষ ২২ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচিতে। সেই কর্মসূচি ছিল :

১. **সর্বাত্মক হরতাল :** ঢাকা শহরের সর্বত্র যথার্থই স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। দোকানপাট রাস্তাঘাট সব বন্ধ। রেল চলাচলসহ সমস্ত যানবাহন বন্ধ। অফিস আদালত বন্ধ। স্কুল-কলেজ বন্ধ।

২. **গায়েবী জানাজা :** ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক শোকাহত

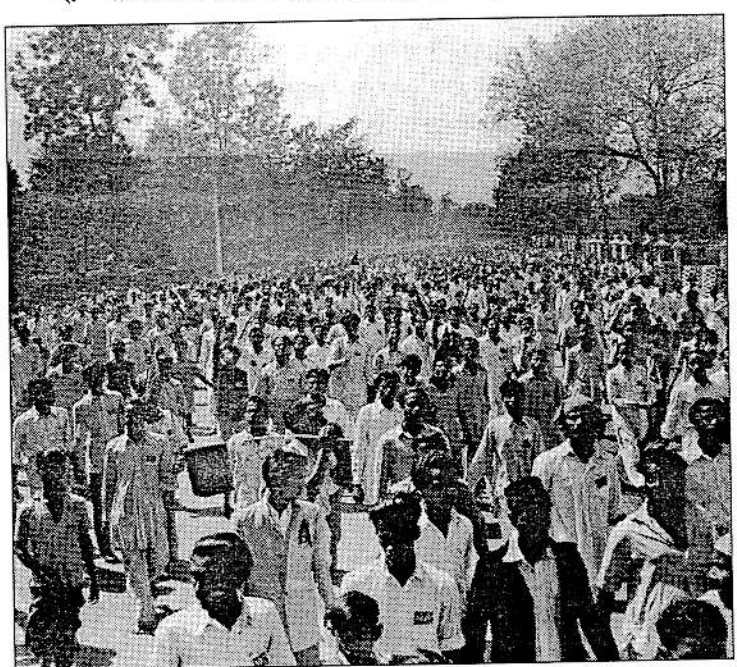

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। শহীদদের জানাযার পর বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল

ঘটনার প্রেক্ষিতে রাতেই ছাত্র-বৈঠক হয়। সেখানকার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে একুশের শহীদদের গায়েবী জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বস্তরের সাধারণ নাগরিক দলে দলে মিছিল করে এসে জানাযায় শরিক হন। অনেকের ধারণা এই শোকসভা এবং জানাযায় প্রায় ত্রিশ হজার লোক অংশ নেয়।

৩. **জানাজা শেষে শোক শোভাযাত্রা :** ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখ সারাদিনই ঢাকা শহর উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটেছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় খণ্ড খণ্ড মিছিল বা শোক শোভাযাত্রা হয় জানাযার আগে এবং পরে। সেসব মিছিল ছিল স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। 'নুরুল আমিনের কল্লা চাই।' 'খুনের বদলা খুন চাই।' এই রকম আরো অনেক গগনবিদারী স্লোগানে তারা ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখের ঢাকা নগরীকে জাগিয়ে রাখে।

৪. **কালোব্যাজ ধারণ :** শহীদের স্মরণে শোক ও সংহতি জানাবার উদ্দেশে ৪০ দিনব্যাপী পোশাকের সঙ্গে কালো ব্যাজ পরিধানের সিদ্ধান্ত হয়। ছাত্ররা তো বটেই। সচিবালয়ের কর্মকর্তাকর্মচারী, পথচলতি লোকজন স্বেচ্ছায় কালোব্যাজ ধারণ করে। বাড়িতে বাড়িতে কালো পতাকা তোলা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক আব্দুল মতিনের সাক্ষরে এইসব কর্মসূচি ছাপা একটি লিফলেট ২১শের রাতেই এশার নামাজের পর মসজিদগুলোতে ও মেসগুলোতে এবং রাতে ব্যারাক, হল, হোস্টেলে কিছু কিছু পরিমাণে বিলি করা হয়। সেদিনের পরিস্থিতি ছিল এমনই যে একটি লিফলেটই শত শত লিফলেটের কাজ করেছে। ফলে ২২ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি কোনো না কোনোভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে যায় এবং যথাসময়ে তারা সাড়াও দেয়।

ঢাকার বাইরে একুশ

পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা। একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ঢাকায়। ভাষার প্রশ্নে ছাত্রআন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে ঢাকা শহরেই। দিনে দিনে সে আন্দোলনে যুক্ত হয় সচিবালয়ের কর্মচারী, শিক্ষক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, সর্বস্তরের সচেতন নাগরিকেরা। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত আসতে আসতে সে আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে দেশের অধিকাংশ

মফস্বল শহরেও। শুধু শহরই বা বলি কেন, গ্রামাঞ্চলের স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও সভা-সমাবেশ-মিছিল করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি জানিয়েছে। কোথাও কোথাও ছাত্রদের প্রতিবাদী মিছিলে জনসাধারণও স্বেচ্ছায় অংশ নিয়েছে, দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। ফলে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়—১৯৫২ আসতে আসতে ভাষা আন্দোলন সারাদেশে (পূর্ববঙ্গে) ছড়িয়ে পড়ে এবং গণভিত্তি পেয়ে যায়।

একুশের কর্মসূচির অন্যতম একটি অংশ ছিল প্রদেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল। ঢাকার বাইরে অনেক শহরেই পালিত হয়েছে হরতাল। শুধু স্কুল-কলেজই নয় কলকারখানা দোকানপাটও বন্ধ থাকে। ঢাকার নিকটবর্তী শহর, বন্দর-শহর নারায়ণগঞ্জ উত্তাল হয়ে ওঠে একুশের কর্মসূচিতে। এখানেও গঠিত হয় সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদের নেতৃত্বেই মিটিং-মিছিল হয়। ছাত্রদের সঙ্গে এক মিছিলে শরিক হয় জনসাধারণও। ঢাকার অদূরে মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জেও একুশের কর্মসূচি পালিত হয় যথাযথভাবে, বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায়।

বন্দর নগরী চট্টগ্রাম উত্তাল হয়ে ওঠে একুশের আন্দোলনে। সর্বাত্মক হরতালে অচল হয়ে পড়ে চট্টগ্রাম। এ অঞ্চলের মফস্বলের স্কুল কলেজেও হরতাল পালিত হয়। সভা-শোভাযাত্রা সর্বত্রই হয়। স্লোগান ওঠে—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, আরবি হরফ চলবে না চলবে না। চট্টগ্রাম শহরের লালদীঘি ময়দানে জমায়েত হয় প্রতিবাদী ছাত্রজনতা বিপুল সংখ্যায়। এই লালদীঘি ময়দানেই ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত প্রথম কবিতাটি জনসমক্ষে গঠিত হয়। কবি মাহবুব উল আলম, আবেগ থরথর কণ্ঠে সমবেত জনতাকে শোনান : 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি।'

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকেই উত্তরাঞ্চলের শহর রাজশাহী রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এখানেও ঢাকার মতোই সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। সারাদিন হরতাল-মিছিল শেষে ছাত্রজনতা বিকেলে সমবেত হয় স্থানীয় ভুবনমোহন পার্কে। এখানে বিভিন্ন বক্তা রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে উচ্চকণ্ঠে দাবি জানায়। ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ঢাকায় ছাত্রহত্যার খবর এসে পৌঁছুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে রাজশাহীর ছাত্র জনতা। পরদিন এক মাইল দীর্ঘ নিরব শোভাযাত্রা শহরের প্রতিটি রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রা শেষে জনসভায় মিলিত হয়ে হত্যাকারী নুরুল আমিন সরকারের পদত্যাগ দাবি করে।

কোথায় নয়! পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় যথারীতি হরতাল, মিছিল, স্লোগান, জনসভার মধ্য দিয়ে একুশের কর্মসূচি পালিত হয়। সব জায়গাতেই

ছাত্রদের পাশে এসে একাত্মতা ঘোষণা করে অন্যান্য শ্রেণিপেশার মানুষও। একুশের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের খবর ঢাকা থেকে ছড়িয়ে পড়লে যশোর, খুলনা, বরিশাল, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি শহরে এই ভাষা আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয় আরো দু-তিন দিন এবং তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়। বিলম্বে হলেও স্থানীয় পর্যায়ে এ আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটিও কোথাও কোথাও গঠন করা হয়।

ফেব্রুয়ারি ২২ তারিখ : উত্তাল সারাদেশ

পূর্বের ঘোষণা ছিল—২২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ২১ তারিখের শহীদদের লাশ নিয়ে জানাজা ও বিক্ষোভ মিছিল হবে। ঘোষণা অনুযায়ী ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই হাজার হাজার ছাত্র-জনতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জড়ো হতে থাকে। শহীদদের লাশ নিয়ে মিছিলের পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে পূর্বের রাতেই পুলিশ মর্গ থেকে লাশ সরিয়ে নিয়ে দাফনের ব্যবস্থা করে আজিমপুর গোরস্থানে। তখন লাশ ছাড়াই গায়েবি জানাজা হয় মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে। অংশ নেয় হাজার হাজার ছাত্র-জনতা। জানাযা শেষে প্রতিবাদী মিছিল। প্রতিবাদী হলেও তারা সহিংস নয় মোটেই। কিন্তু নুরুল আমিনের পেটোয়া পুলিশ শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপরে নির্বিচারে গুলি চালায়। শুধু পুলিশ নয়, নিরস্ত্র মানুষের আন্দোলন দমন করতে সেদিন সামরিক বাহিনীও মোতায়েন করে। ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান হাইকোর্টের কর্মচারী সফিউর রহমান, রিকশাচালক আব্দুল আউয়াল, ঢাকার কিশোর ওহিউল্লাহ এবং তাঁতিবাজারের যুবক সিরাজউদ্দিন।

এত খুন! এত রক্ত! আর কত সইবে বাঙালি! আর কত বাংলা মায়ের বুক খালি হবে! খবর ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে না। পুলিশের পাশে আর্মি যুক্ত হয়েছে শুনেও কেউ ভয় পায় না। সবাই নেমে আসে রাস্তায়। রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা কেন্দ্রে তালা মেরে মিছিল করে বেরিয়ে আসেন কবি ফররুখ আহমদ, সিকান্দার আবু জাফর, আব্দুল আহাদ, আব্দুল লতিফ প্রমুখ কবি ও শিল্পীরা।

দৈনিক আজাদের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য, রাজনীতি করেন মুসলিম লীগের। কিন্তু সরকারের এই নিষ্ঠুর ও ন্যক্কারজনক ভূমিকায় তিনি এমনই মর্মাহত এবং উত্তেজিত হন যে প্রথমে তিনি এইসব হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পরিষদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। পরে মুসলিম লীগের রাজনীতি থেকেই নিজেকে সরিয়ে নেন, ত্যাগ করেন মুসলিম লীগ। সিলেট থেকে প্রকাশিত 'নওবেলাল'-

এর সম্পাদক মাহমুদ আলীও ছিলেন প্রাদেশিক আইন পরিষদের মুসলিম লীগের সদস্য। তিনিও বিবেকের তাড়নায় সদলবলে মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন এবং পরিষদ সদস্য পথ থেকেও পদত্যাগ করেন।

মুসলিম লীগের দুটি পত্রিকা ছিল ঢাকায়—সংবাদ এবং মর্নিং নিউজ। কাগজ দুটি ভাষা-আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিরামহীন নিন্দা ও অপপ্রচার চালিয়ে আসছিল বলেই জনগণের প্রচুর ক্ষোভ ছিল এই কাগজ দুটির উপরে। তাই বিক্ষুব্ধ জনতা পত্রিকা দুটির অফিসে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। মুখেও স্লোগান দেয়—জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দীর মুক্তি চাই। নুরুল আমিনের বিচার চাই।

পুলিশ ও সেনাবাহিনীর প্রবল বাধা উপেক্ষা করেও বিক্ষোভ-মুখর এই দিনে ছাত্র জনতা সমবেত হয় ভিক্টোরিয়া পার্কে (বর্তমানে বাহাদুর শাহ পার্ক) এবং সেখানে বক্তব্য রাখেন অলি আহাদ, আব্দুল মতিন, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ। 'শহীদদের স্মরণে অনুষ্ঠিত জানাজা এবং হরতাল কর্মসূচির তীব্রতা দেখে ঐ দিনই (২২ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন পূর্ববঙ্গ

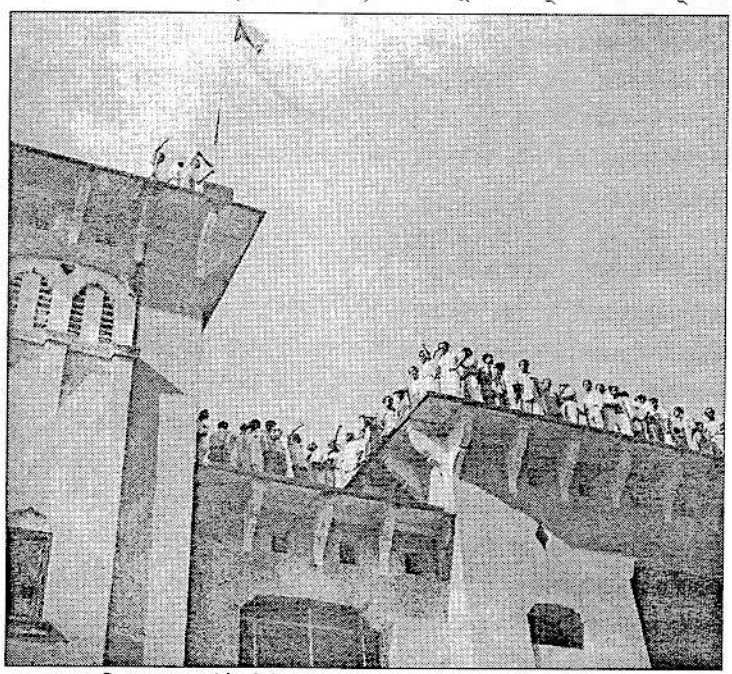

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। আর্টস বিল্ডিং-এর ছাদে ছাত্রদের কালো পাতাকা উত্তোলন

আইন পরিষদে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রস্তাব পাস করতে বাধ্য হন।'[৩৮]

উত্তেজিত জনতার উগ্রমূর্তি দেখে পূর্ববঙ্গ সরকারের মন্ত্রিরা পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে সেনাবাহিনীর বুকের মধ্যে আশ্রয় নেয়। উর্দুর পক্ষে যারা দালালি করেছে, তারা ভয়ানক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে—কখন কী যে হয়! শাহ্ আজিজ এবং খাজা খয়েরউদ্দিন নামে দুই দালালকে ধরে এনে ছাত্রাবাসের গেটে বেঁধে রাখে ছাত্ররা। এ ছিল মৌচাকে ঢিল মারার ফল।

পরদিন খবরের কাগজে লেখা হয় : ২২ তারিখের গুলিবর্ষণে মোট পাঁচজন শহীদ হয়েছে, ১২৫ জন আহত এবং শত শত গ্রেফতার হয়ে নুরুল আমিনের কারাগারে আটক। দৈনিক মিল্লাতে খবর বেরোয় মর্মান্তিক : শহীদের লাশগুলো জানাজা ছাড়াই নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে। তথাকথিত ইসলামী সরকারের কাছে মুসলমানের মৃতদেহ পর্যন্ত ধর্মীয় মর্যাদা পায় না, এমনই তাদের ইসলাম! বলা যায় মুসলিম লীগ সরকার এই সব ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজেদেরই কবর রচনার আয়োজন করে। এমন প্রেক্ষিতেই দৈনিক আজাদ সম্পাদকীয় লিখে দাবি জানায় : 'পদত্যাগ করুন'।

আসলে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানের ভিত্তিমূলকেই প্রবলভাবে ধাক্কা দেয়। ধর্মের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, বাঙালির ভাষা আন্দোলন সেই রাষ্ট্রকে বুঝিয়ে দেয়—জাতি গঠনে ধর্মের চেয়ে ভাষার ভূমিকাই অধিক এবং কার্যকর। পরে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় সেই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ফেব্রুয়ারির আরো কয়েক দিন

একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত গর্ভেই জন্ম নেয় বাইশে ফেব্রুয়ারির গণঅভ্যুত্থান। ছাত্রদের আন্দোলনে যুক্ত হয় গণমানুষ। ভাষার আন্দোলন হয়ে ওঠে জাতির আন্দোলন। ধীরে ধীরে শহর-নগর-গ্রামজুড়ে গোটা জাতিই সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে এই আন্দোলনে। ১৪৪-ধারা জারি করে, পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনী নামিয়ে, নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে, লাশ গুম করে, ছাত্রদের গ্রেফতার করে–বিভিন্ন উপায়ে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হবার পর সরকার খানিকটা পিছু হটে আসে। ২৩ ফেব্রুয়ারি সারা দিন যেন নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকা পালন করে সরকারের পুলিশ-আর্মি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয় ধর্মঘট। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এ দিন ঘোষণা করে—২৫ ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ববাংলায় হরতাল।

২৩ ফেব্রুয়ারির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠা। না, আজকের বিশাল শহীদ মিনার নয়; তখন সেটা ছিল 'শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ।' এ প্রসঙ্গে ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক জানাচ্ছেন : শহীদ মিনার তৈরির ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে। 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক' এই স্লোগান মাথায় নিয়ে মেডিকেল হোস্টেলের ছাত্ররা এ অভিনব কাজে নামে। রাত তখন দশটা। বাইরে রাস্তায় যথারীতি কার্ফ্যু তখনো চালু। এর মধ্যেই পরিকল্পনা মাফিক হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদদের রক্তেভেজা স্থানটিতে শহীদ মিনার তৈরির কাজ শুরু হয়। সে রাতে প্রতিটি ছাত্র এ কাজে অংশ নেয়। ... তখন ভোর হয়ে এসেছে, কাজও শেষ। বাইরে কার্ফ্যু সত্ত্বেও কেউ ভয় পায়নি। কাজ শেষে ঐ কাঁচা শহীদ মিনারের গায়ে সেঁটে দেয়া হলো 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ' লেখা ফলক। ভোর ৬টায় এই অস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ শেষ হলে সকাল ১০টায় শহীদ সফিউর রহমানের পিতাকে দিয়ে তা প্রথমবারের মতো উদ্বোধন করানো হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি। আকারে ছোটখাটো ঐ শহীদ মিনার যে শক্তিতে ছোট নয়, সামান্য নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল শহীদ মিনারের প্রতি জনগণের আকর্ষণ থেকে। কীভাবে যে খবর পায় কে জানে, দলে দলে মানুষ দেখতে আসে শহীদ মিনার, যেমন তারা এসেছিল একুশে ফেব্রুয়ারি বিকেলে শহীদদের দেখতে। ঐ আসা ছিল তাৎক্ষণিক, কিন্তু এবারের যাওয়া-আসার বিরাম নেই।

ছোট্ট বন্ধুরা, এই প্রসঙ্গে তোমরা জেনে রাখো—১৯৫২ সালের এই প্রথম শহীদ মিনারের নকশাটি তৈরি করেছিলেন সেই সময়ের ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র সাঈদ হায়দার। এখন যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার তোমার আমার সবার কাছে পরিচিত, এটা তৈরি হয়েছে অনেক পরে। এই নকশাটি করেছেন শিল্পী হামিদুর রহমান।

২৪ ফেব্রুয়ারি নুরুল আমিনের সরকার রাজপথে আরো অধিকসংখ্যক পুলিশ এবং আর্মি মোতায়েন করে এবং ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেশের বিশৃঙ্খল পরিবেশ স্বাভাবিক করার ঘোষণা দেয়। আর এই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার করা হয় ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় সকল শীর্ষ নেতাদের।

ছাত্রদের অবিরাম বিক্ষোভ দমন করার জন্যে সরকার শেষ পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে ২৫ ফেব্রুয়ারি।

বিক্ষুব্ধ এই পরিবেশের মধ্যেই আইন পরিষদ থেকে পদত্যাগকারী সদস্য, দৈনিক আজাদের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন ২৬ ফেব্রুয়ারিতে এসে পুনরায় উদ্বোধন করেন নবনির্মিত শহীদ মিনার। আর এই

দিনই বিকেল নাগাদ পুলিশ এবং আর্মি এসে আকস্মিকভাবে শহীদ মিনারে হামলা চালায় এবং মাটির সঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। মাত্র ৩ দিন বয়সের প্রথম শহীদ মিনারটি আজ আর নেই, এমন কি ঐতিহাসিক সেই স্থানটিও বর্তমান অবস্থান অনুযায়ী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আউটডোর বিভাগ সংলগ্ন ডিসপেন্সরি ভবনটির নিচে চাপা পড়ে গেছে; তবু সেই শহীদ মিনার ভবিষ্যতে জাতির জন্যে হয়ে ওঠে প্রতিবাদ ও প্রেরণার উৎস। শহীদ মিনার ভেঙে ফেলার কারণে কবি আলাউদ্দীন আল আজাদ কবিতা লিখে প্রতিবাদ জানান :

'স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার?
ভয় কি বন্ধু
আমরা এখনো চার কোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো!'

একুশ চলে এগিয়ে

একুশ একটি গাণিতিক সংখ্যা। কিন্তু বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন এসে বাঙালি জাতির কাছে 'একুশ' শব্দের তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা বদলে দিয়েছে। ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ বাঙালির ইতিহাসের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় উজ্জ্বল এক মাইল ফলক। এইখানে এসে বাঙালি পেয়েছে আত্মপরিচয়ের সন্ধান। আর্য-অনার্য, মোগল-পাঠান, হিন্দু-মুসলিম সব পরিচয়ের বেড়া টপকে এই একুশে এসে বাঙালি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে তার পরিচয়—সে বাঙালি। এইখানে এসে তার পথপরিক্রমার ঘটে বাঁক-বদল। আর নয় অন্য পরিচয়, এইবার তার বাঙালিত্বের পরিচয়েরই কাঠামোগত প্রতিষ্ঠা চায়। সে কারণেই স্বাধিকার আন্দোলন এবং সবশেষে

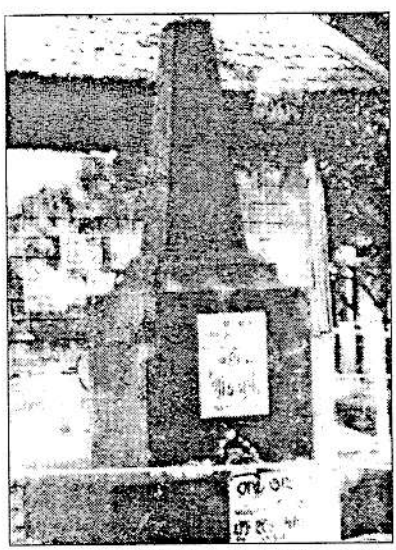

একুশের প্রথম শহীদ মিনার মাত্র চারদিনের মাথায় পাকিস্তানি পুলিশ ও আর্মিরা ভেঙে গুড়িয়ে দেয়

মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা যুদ্ধ। তাই একুশ আমাদের অবিনশ্বর জাতীয় চেতনার অন্যনাম। একুশই প্রেরণা, একুশই শক্তি।

একুশের চেতনা এবং প্রেরণা অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আমাদের শিল্প সাহিত্যে, গানে ও কবিতায়। আর রাজনীতির কথা তো বলাই বাহুল্য– বায়ান্নো-পরবর্তী বাঙালির রাজনীতি বিকশিত হয়ে ওঠে একুশকে কেন্দ্র করেই। ছোট্ট বন্ধুরা, বড় হয়ে তোমরা নিশ্চয় জানবে—বায়ান্নোর একুশ থেকে বাঙালি কিভাবে একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বরে পৌঁছেছে সেই সংগ্রামমুখর ইতিহাস। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত শিল্প সাহিত্য সংগীত প্রতিটি বাঙালিকে প্রাণিত করেছে, উদ্বুদ্ধ করেছে মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে। তোমাদের জন্যে সামান্য দু-চারটি উদাহরণ দিই। কবি মাহবুবউল আলম চৌধুরীর কথা তো আগেই বলেছি। কী সাংঘাতিক প্রতিবাদী কবিতা ভাবতে পারো? কবির সে প্রতিবাদ কবিতার নামকরণেই ফুটে উঠেছে : 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি।' কার ফাঁসি চান কবি? কবিতার ভেতরে ঢুকলে বিস্তারিত জানা যায়। কবিতায় তিনি বলেছেন :

এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
আমি তাদের ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি
যারা আমার অসংখ্য ভাইবোনকে
নির্বিচারে হত্যা করেছে।

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই লেখা এ কবিতা, তবু কবি আজ আর ভাষার দাবিও জানাতে চান না খুনিদের কাছে। কবি বলেছেন :

যারা গুলি ভরতি রাইফেল নিয়ে এসেছিল ওখানে
যারা এসেছিল নির্দয়ভাবে হত্যা করার আদেশ নিয়ে
আমরা তাদের কাছে
ভাষার জন্য আবেদন জানাতেও আসিনি আজ
আমরা এসেছি খুনি জালিমের ফাঁসির দাবি নিয়ে।

ফেব্রুয়ারির ২১ এবং ২২ তারিখে ঢাকা শহরে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ছাত্র হত্যার খবর পৌঁছে যায় নিভৃত গ্রামাঞ্চলেও। কেঁদে ওঠে গ্রাম্য কবির প্রাণ। তাঁর মুখে রচিত হয় অমর গান :

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনও করিলিরে বাঙালি
তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি।

তোতা পাখি পড়তে এসে হারাইলিরে প্রাণ
মায় সে জানে পুতের বেদন যার কলিজার জান।

ইংরেজ যুগে হাঁটুর নিচে চালাইত যে গুলি
এখন স্বাধীন দেশে ভাইয়ে উড়ায় ভাইয়ের মাথার খুলি।

ভাষা আন্দোলনের খবর গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষের অন্তরেও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মুখের ভাষা (মাতৃভাষা) কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র তারাও মেনে নিতে পারেনি। প্রতিবাদ জানিয়েছে। গণসঙ্গীতের অমর শিল্পী আব্দুল লতিফ গাঁয়ের মানুষের ভাষাতেই শুনিয়েছেন গান :

ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়
ওরা কথায় কথায় শিকল পরায় আমার হাতে পায়।

কইতো যাহা আমার দাদায়
কইছে তাহা আমার বাবায়
এখন কও দেখি ভাই মোর মুখে কি
অন্য কথা শোভা পায়।

সইমু না আর সইমু না
অন্য কথা কইমু না
যায় যদি ভাই দিমু সাধের জান।
ঐ জানের বদলে রাখুমরে
বাপ দাদার জবানের মান।

ভাষা সৈনিক গাজীউল হকও লিখেছেন ভাষা আন্দোলনের গান :

ভুলবো না ভুলবো না ভুলবো না
সে একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলবো না
লাঠি গুলি টিয়ার গ্যাস মিলিটারি আর মিলিটারি
ভুলবো না।

ছোট্ট বন্ধুরা, এখন আমরা প্রভাতফেরিতে একুশের যে অমর গানটি গাই, এটি লিখেছেন আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী। সেই ১৯৫২ সালে তিনি ছিলেন ঢাকা কলেজের ছাত্র। মর্মান্তিক ছাত্রহত্যার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে তিনি দীর্ঘ একটি কবিতা লেখেন। প্রথমে আব্দুল লতিফ এবং পরে আলতাফ মাহমুদ সেই কবিতায় সুরারোপ করেন। আলতাফ মাহমুদের সুরারোপিত গানটিই হয়ে ওঠে জনপ্রিয় একুশের গান :

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারি ...।

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন বাঙালি কবি সাহিত্যিককে এত গভীরভাবে আন্দোলিত করে যে সেই বায়ান্ন থেকে অদ্যাবধি একুশের তাৎপর্য নিয়ে অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়ে চলেছে এবং আগামীতেও হবে। এরই মাঝে জহির রায়হান লিখেছেন একুশের গল্প, আরেক ফাল্গুন, মুনীর চৌধুরী লিখেছেন একুশের নাটক কবর, সেলিনা হোসেন লিখেছেন একুশের উপন্যাস নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি এবং আরো অনেকের শিল্পকর্ম এই সঙ্গে যুক্ত হয়েই চলেছে। কিন্তু ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশের সংকলনটি লাভ করেছে ঐতিহাসিক ভিত্তি।

একুশের প্রবাহ

বায়ান্নোর একুশ কেবল বায়ান্নোতেই সীমিত থাকেনি, বরং তা বাঙালির জাতীয় জীবনে এনে দিয়েছে অন্তহীন বেগবান স্রোতধারা। এই স্রোতধারা ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৭০, ১৯৭১—বিভিন্ন সালে হয়ে উঠেছে প্রবল ঊর্মিমুখর, সৃষ্টি হয়েছে বিশাল তরঙ্গ অভিঘাত। আর সে অভিঘাত ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালি জীবনের সর্বত্র। একুশের চেতনার আলোক প্রভায় বাঙালি খুঁজে নিয়েছে তার আপন অস্তিত্বের ঠিকানা।

মায়ের মুখের ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে ঢাকার রাজপথে। সুমহান সেই স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাবার জন্যে বাঙালির বুকের মমতা দিয়ে গড়া 'শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ'কে ভয় পেয়েছে পাকিস্তান সরকার। তাই তারা নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে দিয়েছে বাঙালির স্মৃতির মিনার। কিন্তু তারা জানে না বুকের গভীরে স্থাপিত মিনার কিছুতেই উপড়ে ফেলা যায় না, বরং শক্তি যোগায় সামনে চলার, সাহস যোগায় শত্রুর মোকাবিলা করার।

পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৪৮ সালে ছাত্রদের সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে চুক্তি করেও চুক্তিভঙ্গ করেন খাজা নাজিমউদ্দিন। আন্দোলনের ভয়ে ভীত পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব পাস করানোর পরও ১৪ এপ্রিল আইন পরিষদে সেই প্রস্তাব বাস্তবায়নের কথা উঠলে নিজেকে পূর্বের অবস্থান থেকে সরিয়ে নেন। পরিষদে সৃষ্টি হয় অচলাবস্থা।

ক্ষমতাসীন শাসকদের এসব বিশ্বাসঘাতকতার কথা সহজে ভোলে না এ দেশের সাধারণ মানুষ। ঢাকা শহরে তো বটেই বলতে গেলে সারা দেশেই (পূর্ববঙ্গ) বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা আর আবেগ নিয়ে ১৯৫৩ সালের শহীদ দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি) পালনের আয়োজন করা হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রায় সব সদস্য গ্রেফতার হবার কারণে ইতোমধ্যে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ ও ইডেন কলেজসহ প্রধান প্রধান স্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে ব্যাপক ভিত্তিতে প্রথম শহীদ দিবস পালিত হয়। প্রভাতফেরি, শহীদদের কবরে পুষ্পাঞ্জলি দেয়া, সভা-সমাবেশ ও নতুন করে রাষ্ট্রভাষার দাবি আদায়ের পক্ষে শপথ নেবার মধ্য দিয়ে শহীদ দিবসের কর্মসূচি শেষ হয়।

১৯৫৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস পালনের ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। প্রস্তুতি যথেষ্ট নেয়া সম্ভব হয়নি। সামনে নির্বাচন। একুশে উদ্‌যাপনের আগেই ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ তার জবাবও দেয় মুসলিম লীগের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে। বায়ান্নোর পর মাত্র দুবছরের মধ্যেই বাঙালি খুঁজে নেয় ঠিকানা, বিপুল ভোটে বিজয়ী করে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের। বাংলায় মুসলিম লীগের ভরাডুবি। এমনটি ঘটে একুশের প্রভাতেই। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকদের আবার সেই চক্রান্ত। মাত্র ২৭ দিনের মাথায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে (৩০ মে ১৯৫৪) বাতিল করে কেন্দ্রের শাসন তথা সামরিক শাসন চালু করা হয়। নিয়োগ করা হয় গভর্নর। জারি হয় ৯২ক ধারা।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিলের পর পূর্ববঙ্গের কয়েক হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মী গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে এ দেশের সাধারণ জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে পাকিস্তান সরকার। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৫ সালে শহীদ দিবস আসে নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে। ছাত্ররা প্রায় প্রত্যেক ছাত্রাবাসে, কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছোটখাটো অস্থায়ী শহীদ মিনার তৈরির মাধ্যমে সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। শিশিরভেজা একুশের ভোরে ছাত্রদের কণ্ঠে ভেসে আসে প্রাণের দাবি : 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, শহীদ-দিবস অমর হোক।' দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই সরকারের পেটোয়া পুলিশ এসে সব তছনছ করে দেয়। ছাত্রাবাস ঘিরে ফেলে ঘরে ঘরে তল্লাশি, ভাঙচুর, গ্রেফতার চালায়। তবু ঢাকার বাইরে অনেক জায়গায় যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে শহীদ দিবস পালিত হয়।

অবস্থা পাল্টে যায় ১৯৫৬ সালে এসে। এরই মধ্যে 'পূর্ববঙ্গ' নাম বদলে হয়ে যায় 'পূর্ব পাকিস্তান'। পূর্ব পাকিস্তানে তখন যুক্তফ্রন্টের শরিক কৃষক প্রজা

পার্টির শাসন, মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন। ৯২-ক প্রত্যাহার হয়েছে আগেই। ফলে এ বছর শহীদ দিবস পালিত হয় সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশে। প্রকৃতপক্ষে, এ বছরই প্রথমবারের মতো একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারিভাবে শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয় এবং এদিন সরকারি ছুটিও ঘোষণা করা হয়। ১৯৫৬ সালে বর্তমান শহীদ মিনারের স্থানে শহীদ মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে সরকার। সেই প্রস্তুতির খবর পেয়ে ছাত্র-জনতা ২০ ফেব্রুয়ারি রাতেই ভাষা শহীদ আব্দুল আওয়ালের ৬ বছরের শিশুকন্যা বসিরণকে দিয়ে শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়ে নেয়। পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে আবার আনুষ্ঠানিকভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন যৌথভাবে ভাষা শহীদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম মওলানা ভাসানী এবং মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার। ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের এক প্রস্তাবে বলা হয় 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা'। শিল্পী হামিদুর রহমানের পরিকল্পনা ও নক্সা গ্রহণ করে দ্বিতীয়বার শহীদ মিনার তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয় এ বছরেই। প্রকৃতপক্ষে শহীদ মিনার তৈরির কাজ শুরু হয় ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে। ১৯৫৮ সালে আইউব খানের সামরিক শাসন এলে এই শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকে কয়েক বছর। বৈরী পরিবেশের কারণে শহীদ দিবসও যথাযথভাবে উদযাপিত হতে পারে না। কিন্তু ক্ষুব্ধ বাঙালি ভেতরে ভেতরে ঠিকই ফুঁসতে থাকে। মূলত বাঙালির অন্তরে ধূমায়িত এই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে '৬২-র শিক্ষা আন্দোলনে, '৬৬-র ৬-দফা প্রচারণায়, '৬৯-র গণঅভ্যুত্থানে, '৭০-র নির্বাচনে, '৭১-র মুক্তিযুদ্ধে। আর এ সবের পেছনে প্রেরণা বাতিটি জ্বেলে দিয়েছে মহান একুশ।

আইউব খানের অভিনব জগাখিচুড়ি

আইউবের সামরিক শাসন আমলের গোড়ার দিকে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বাংলা ও উর্দু মিলিয়ে একটা জগাখিচুড়ি ভাষা তৈরির অপচেষ্টা চলতে থাকে। প্রেসিডেন্ট আইউব মনে করতেন উর্দু অথবা বাংলা কোনোটাই এককভাবে সমগ্র পাকিস্তানের ভাষা হতে পারে না, দরকার উভয়ের সংমিশ্রণ। প্রেসিডেন্টের এই দর্শনকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে শরীফ শিক্ষা কমিশন (ক্ষেত্রবিশেষে বাংলা একাডেমিও) রোমান হরফ প্রবর্তন, বাংলা বর্ণমালা সংস্কার, বাংলা-উর্দু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা—এ ধরনের বেশ কিছু তুঘলকি পরিকল্পনা নিতে শুরু করে। এসব করতে গিয়ে দালাল পরিকল্পনাবিদের দল (এরা বঙ্গসন্তানও বটে) বাংলা সাহিত্যের

চিরায়ত ঐতিহ্যেরও নির্লজ্জ সংস্কার শুরু করেন। কাজী নজরুলের সুবিখ্যাত রণসঙ্গীত 'চল্ চল্ চল্' এর এক চরণে আছে 'নব-নবীনের গাহিয়া গান, সজীব কবির মহাশ্মশান'। তারা নির্লজ্জভাবে ছুরি চালায়, কবির অনমুতির তোয়াক্কা না করেই লিখে নেয় 'সজীব করিব গোরস্থান।' চিরদিন আমরা পড়ে এসেছি :

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি...

না, এ রকম পাঠ আর চলবে না। ভাষারও মুসলমানিকরণ ঘটে এই দালালদের হাতে। তারা আমাদের জন্য সংশোধিত পাঠ উপহার দেন। তাতে লেখেন :

ফজরে উঠিয়া আমি দিলে দিলে বলি
সারাদিন আমি যেন নেক হয়ে চলি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে এ রকম অশুভ চক্রান্তের সূচনা ১৯৫৯ সালের গোড়া থেকেই। বিকৃত বুদ্ধিজীবীদের এসব অন্যায় বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদও শুরু হয় তখন থেকেই। ১৯৫৯ সালে সর্বদলীয় ছাত্র সংগঠনসমূহের সম্মিলিত একুশের অনুষ্ঠানে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এই সব অশুভ অপতৎপরতার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। সভাপতির ভাষণে তিনি রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রস্তাবসহ অন্যান্য সব সংস্কার সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। সেদিনের ওই মঞ্চ থেকে ছাত্ররাও সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে এ রকম অন্যায় অপপ্রয়াস তারা মেনে নেবে না। একুশের চেতনার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে যে ছাত্রসমাজে, তারা এসব অশুভ পাঁয়তারা কেন মেনে নেবে!

তবে আমাদের এই দেশে গাছের পাশে বিস্তর আগাছাও জন্মায়। দালাল ও বিকৃত বুদ্ধিজীবীর অভাব হয়নি কোনো কালেই। ১৯৬৭ সালে এমনই এক ঘটনা ঘটে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধকরণের উদ্ভট প্রস্তাব ওঠার কালে। তখন পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন। ১৯৬৭ সালের ২৩ জুন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে তিনি ঘোষণা করেন—রেডিও পাকিস্তানসহ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চা ও প্রচার বন্ধ করা হবে। পাকিস্তানের ইসলামিক কৃষ্টির পক্ষে রবীন্দ্রচর্চা নাকি প্রবল অন্তরায়। ব্যাস, এ কথায় সাঁয় দেয়ার জন্যে দালাল বুদ্ধিজীবীও জুটে যায়। তারা কাজী নজরুলকে দাঁড় করাতে চায় রবীন্দ্রনাথের মুখোমুখি। এই কপট নজরুল-দরদীরা নজরুলকেও প্রকৃত শ্রদ্ধা করে না। রবীন্দ্রনাথকে তো নয়ই।

যা হোক, কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রীর এই রবীন্দ্রবিরোধী ঘোষণার পর পরই এ দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ তীব্র বিরোধিতা করে বিবৃতি দেন, ২৬ জুনের দৈনিক পাকিস্তানে তা প্রকাশিত হয়। উক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন : ড. কুদরত-ই-খুদা, কাজী মোতাহার হোসেন, সুফিয়া কামাল, মুহম্মদ আব্দুল হাই, খান সারোয়ার মুরশিদ, সিকান্দর আবু জাফর, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ড. আহমদ শরীফ, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, শামসুর রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, ড. আনিসুজ্জামান, ড. রফিকুল ইসলাম, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রমুখ।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা : সাংবিধানিক স্বীকৃতি

১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত এবং গৃহীত হয় ১৯৫৬ সালে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। সে বিতর্ক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিতন্ডায় পরিণত হয়। নতুন এ রাষ্ট্রের অবাঙালি শাসকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের মাতৃভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একতরফাভাবে সারা দেশের উপরে চাপিয়ে দেয় উর্দু। বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ বলেই শুধু নয়, যে কোনো বিবেচনায় পাকিস্তানের নাগরিকদের অন্য যে কোনো ভাষার তুলনায় ঐতিহ্য, ঐশ্বর্য এবং প্রাণসম্পদে বাংলা ভাষা শ্রেষ্ঠ বলেই শুরু থেকে বাঙালিরা দাবি জানিয়েছে—পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও স্থান দেয়া উচিত। কিন্তু কে শোনে কার কথা! বাংলা ভাষার এই যৌক্তিক দাবিকে পাকিস্তান সরকার নানা অজুহাতে উপেক্ষা করে। কখনো পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির কথা বলে, কখনো ধর্মের দোহাই পাড়ে, ছল-চাতুরি আর টালবাহানার শেষ নেই তাদের। ১৯৫২-তে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে বাংলা মায়ের সোনার ছেলেরা বুকের রক্তে রঞ্জিত করে ঢাকার রাজপথ। প্রবল দমন-পীড়ন গুলিবর্ষণের মুখেও বাঙালি তার ন্যায়সঙ্গত দাবি থেকে একটুখানিও সরে না নড়ে না। দাবি তাদের 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।'

বহু চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের পর পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের (বাঙালির) ন্যায্য দাবিকে স্বীকৃতি দেয়া হয় পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে। ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের এক প্রস্তাবে বলা হয় 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা।' এই সাংবিধানিক স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক বিজয় সূচিত হয়। আনুষ্ঠানিকই বটে, এ প্রস্তাব মোটেই আন্তরিক নয়। তাই ওই স্বীকৃতির সঙ্গে শর্ত জুড়ে দিয়ে বলা

হয়—এখন নয়, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা চালু হবে আরো বিশ বছর পরে। হিসেব করে দেখ তো ছোট বন্ধুরা, কত সালে এসে সেই বিশ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার কথা! হবে ১৯৭৬ সালে। তোমরাই ভেবে দেখ—একি স্বীকৃতি, নাকি চালাকি! নাকি বদমায়েশি?

বহু ষড়যন্ত্রের মধ্যেও বাঙালিকে নিজের পথ কেটে চলতে হয়, তাই ১৯৫৬ সালের ঐ ঘোষণাটুকুকে তারা সাংবিধানিক স্বীকৃতি বলেই গণ্য করে। তারপর ছয় বছরের ব্যবধানে ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইউব খানের শাসনামলে আবারো নতুন করে সংবিধান রচিত হয়। বাংলা ভাষার স্বীকৃতি সেখানেও আছে। কিন্তু আবারো সেই বিশ বছরের জোয়াল চাপিয়ে দেয়া হয় কাঁধে। এবার হিসেব কর—বিশ বছর পরের সেই সালটা হয় ১৯৮২। তার মানে এতদিন যদি পাকিস্তান টিকে থাকতো এবং শাসকেরা যদি কথার দাম রাখত, তাহলে ১৯৮২ সালে এসে বাংলা ভাষা চালু হতো সরকারি উদ্যোগে। শয়তানি আর বলে কাকে! চক্রান্ত করতে যারা অভ্যস্ত, তারা কি সহজে সেই অভ্যাস ছাড়ে! হয়তো সেই চক্রান্তকারীরা ঐ বিশ বছরে বাংলা ভাষাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্যে নতুন কোনো ফন্দি আঁটতো। কিন্তু সব চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার অপরিমেয় শক্তি আছে আমাদের একুশের চেতনার গভীরে। অমর একুশে আমাদের হাত ধরে নিয়ে যায় ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানে, চিনিয়ে দেয় নতুন দিগন্ত—'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা যমুনা।' অমর একুশের আলোক প্রভায় সত্তরের নির্বাচনে বাঙালি চিনে নেয় তার ভোটের বাক্স, ইতিহাসের যুগান্তকারী বিজয় তারা ছিনিয়ে আনে। কিন্তু তাতে কী! আবার সেই ছলচাতুরী, আবার সেই ষড়যন্ত্র। ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি। আলোচনার নামে সময় ক্ষেপণ। অতঃপর ২৫ মার্চ রাতের আঁধারে নিরস্ত্র বাঙালির উপরে চালায় তারা সশস্ত্র হামলা। সেই অবস্থায় আত্মরক্ষার তাগিদেই ঘুরে দাঁড়াতে হয় বাঙালিকে। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। নয় মাসব্যাপী মরণপণ যুদ্ধ করে বাঙালি বিজয় সূর্য ছিনিয়ে আনে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। এ সবই সম্ভব হয় প্রাণের গভীরে মহান একুশের মূলমন্ত্র ছিল বলে। স্বাধীন বাংলাদেশে সংবিধান রচিত এবং গৃহীত হয় ১৯৭২ সালে। এতদিনে পূর্ণ হয় বাঙালির আশা, সংবিধানে ঘোষণা করা হয়—প্রজাতন্ত্রের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

শহীদ মিনারের ইতিকথা

১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সারা রাতের পরিশ্রমে ছাত্রছাত্রীরা ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে, আবুল বরকত যেখানে শহীদ হয়েছিলেন, ঠিক সেইখানে অস্থায়ীভাবে নির্মাণ করে 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ'। এটাই বাঙালির প্রথম শহীদ মিনার। অতি দ্রুত, নিতান্তই অপরিকল্পিতভাবে এবং আবেগতাড়িত তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের ফসল এই শহীদ মিনার। ১৯৫২ সালের পূর্বে ১১ মার্চ পালিত হতো ভাষা দিবস হিসেবে। ১৯৫২ সালের পর আর ভাষা দিবস নয়, আসে শহীদ দিবস, আসে শহীদ মিনার। ২১ এবং ২২ ফেব্রুয়ারি দুদিনে শহীদ হন আমাদের ভাষা শহীদেরা, কিন্তু শহীদ দিবস হিসেবে এই দুদিনের পরিবর্তে নির্ধারণ করা হয় প্রথম দিনকেই, অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের শহীদ দিবস। অপরিকল্পিত এবং অপূর্ণাঙ্গ হলেও প্রথম শহীদ মিনার আমরা পাই '৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। ২৪ তারিখে শহীদ শফিউর রহমানের পিতাকে দিয়ে উদ্বোধন করানো হলেও ২৬ তারিখে আবারো উদ্বোধন করেন সদ্য পদত্যাগকারী মুসলিম লীগ সদস্য এবং আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। এই দিনই সরকারের আর্মি পুলিশ এসে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় এই শহীদ মিনার। কিন্তু স্মৃতির মিনার তারা ভাঙতে পারেনি কখনোই। প্রথম শহীদ মিনারের প্রসঙ্গে ভাষা সৈনিক আহমদ রফিক লিখেছেন :

> এ দৃশ্য যে দেখেনি তার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন, বুঝে ওঠা আরো কঠিন। ফুলের ভারে, চোখের জলে, শোকের স্পর্শে হঠাৎ করেই শহীদ মিনার জাতীয় আবেগের অংশ হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে জাতীয় মর্যাদার প্রতীক, মর্যাদা মূলত মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে। এভাবেই মাত্র আড়াই দিনের মধ্যে হঠাৎ তৈরি এ শহীদ মিনার হয়ে ওঠে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনার প্রতীক এবং আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রেরণা।[৩৯]

১৯৫৩, '৫৪ ও '৫৫ এই তিন বছর ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস পালিত হয় প্রথম শহীদ মিনারের শূন্যস্থানে কাপড়ঘেরা স্থানটিতে ফুল দিয়ে। ১৯৫৬ সাল আসে বাঙালির সামনে অনেক সম্ভাবনা নিয়ে। যুক্তফ্রন্ট তখন পূর্ববঙ্গের ক্ষমতায়। সেবারই প্রথম সরকারিভাবে শহীদ দিবস পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়, সরকারি ছুরি ঘোষণা করা হয়, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন বর্ধমান হাউসে (বাংলাবিরোধী চক্রান্তের স্থান) বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়, সর্বোপরি সরকারি পরিকল্পনায় বর্তমান শহীদ মিনারের জায়গায় নতুন শহীদ মিনার-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শহীদ বরকতের মা হাসিনা বেগম, মওলানা ভাসানী

এবং আবু হোসেন সরকার। শিল্পী হামিদুর রহমানের পরিকল্পনা ও নকশা অনুযায়ী শহীদ মিনার তৈরির কাজ শুরু হয় ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে। হামিদুর রহমানের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন ভাস্কর নোভেরা আহমদ। পরবর্তী বছর ২১ ফেব্রুয়ারির আগেই শহীদ মিনারের ভিত, মঞ্চ ও তিনটি স্তম্ভ নির্মাণ সম্ভব হয়। এই স্তম্ভ তিনটিই আসলে শহীদ মিনারের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে প্রস্ফুটিত করে তোলে। স্নেহময়ী মায়ের দুপাশে দুই সন্তান। সন্তানের প্রতি স্নেহের ভারে যেন মায়ের মুখ আনত। কাজটি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই আইউব খানের সামরিক শাসন শুরু হয় দেশে, বন্ধ হয়ে যায় শহীদ মিনারের অবশিষ্ট কাজ। তবু ১৯৫৮ থেকে '৬২ পর্যন্ত এই পাঁচ বছর সেই অসমাপ্ত শহীদ মিনারেই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে গোটা জাতি, পালিত হয়েছে শহীদ দিবস।

আইউব খানের শাসনামলেই ১৯৬২ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নেয়া হলে বাঙালিদের ভাষা চেতনায় একটুখানি প্রলেপ দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন পূর্বপাকিস্তানের তদানীন্তন গভর্নর আজম খান। তিনি পূর্বপাকিস্তানের শহীদ মিনারের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্যে একটি কমিটি গঠন করে দেন ১৯৬২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি। শিল্পী হামিদুর রহমানের মডেল সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে কাজ শুরু হয়। শহীদ মিনারের এই সংক্ষেপিত রূপের নির্মাণ কাজ এক রকম তাড়াহুড়ো করে শেষ হয় ১৯৬৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি। পরদিন প্রভাতবেলা এই নবনির্মিত শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন ভাষা শহীদ বরকতের মা হাসিনা বেগম। এই সংক্ষিপ্ত আদলের, অনেকাংশে অসম্পূর্ণ এই শহীদ মিনারই বাঙালির জাতীয় চেতনা ও জাতীয়তাবোধের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই শহীদ মিনারের পাদদেশেই কত না শপথ গ্রহণ, এখান থেকেই কত না লড়াই সংগ্রামের শুভ সূচনা! এই শহীদ মিনারই বাঙালিকে অন্ধকারে পথ দেখিয়েছে '৬৬তে, '৬৯-এ, '৭১-এ।

একাত্তরের ২৫ মার্চ কালো রাতে যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে, তখন বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রামের কেন্দ্রভূমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন তারা নির্মম আঘাত হানে, নির্বিচারে হত্যা করে ছাত্র-শিক্ষক, তখন তাদের ভয়াল ছোবল থেকে রক্ষা পায়নি বাঙালি চেতনার বিমূর্ত প্রতীক এই শহীদ মিনারটিও। শুধু পঁচিশের রাতেই নয়, পরদিনও অবিরাম ভারি গোলা বর্ষণে তারা গুঁড়িয়ে দেয় শহীদ মিনারের স্তম্ভগুলো। পরে ভাঙা শহীদ মিনারের পাশে ছোট্ট একটা টিনের চালা খাড়া করে সেখানে লিখে রাখে 'মসজিদ'। শহীদ মিনারের জায়গায় মসজিদ লিখলেই হবে! কার জন্যে এই

মসজিদ? মানুষ তা মেনে নেয়নি। শহীদ মিনারের জায়গাতে শহীদ মিনারই ফিরে এসেছে। স্বাধীন দেশে মসজিদের সাথে তার বিরোধ বাধেনি।

ভাষার লড়াই করতে করতে একটি জাতি শেষে
একাত্তরে পৌঁছে গেল নিজের স্বাধীন দেশে।

হ্যাঁ তাই, ভাষার লড়াই দিয়েই যাত্রা শুরু বাঙালির। যাত্রা আপন পরিচয় খুঁজে বের করার লক্ষ্যে, যাত্রা আপন ঠিকানায় পৌঁছুনোর উদ্দেশে। ১৯৭১-এ নয় মাস ধরে যুদ্ধ করে পেয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতার সিংহদুয়ার খুলেছে বাঙালি ভাষার চাবি দিয়ে। যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে ১৯৭২ সালে বাঙালি একুশে উদযাপন করেছে ভাঙা শহীদ মিনারেই। কিন্তু তারপর?

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে শহীদ মিনারের স্তম্ভগুলো পুনঃনির্মাণ করা হয়। আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় গর্বিত শহীদ মিনার। কিন্তু পূর্ণ অবয়বে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠা আর হয় না তার। ১৯৬৩ সালের সেই সংক্ষেপিত কলেবরেই দাঁড়িয়ে থাকে স্বাধীন বাংলাদেশের শহীদ মিনার। এভাবেই কেটে যায় আরো এক দশক। অবশেষে ১৯৮৩-৮৪ সালে গ্রহণ করা হয় সংস্কারের উদ্যোগ। মূল কাঠামোতে কোনো পরিবর্তন না এনে সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হয় শহীদ মিনারের। এর ফলে সম্প্রসারিত হয়েছে মূল শহীদ মিনারের প্রাঙ্গণের পরিধি ও আয়তন।

শহীদ মিনার মূলত বাঙালির ভাষার লড়াইয়েরই অবিস্মরণীয় স্মারক। পৃথিবীর আর কোনো জাতিকে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যে এভাবে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে হয়নি। এ লড়াই ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের লড়াই। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের অধিকসংখ্যক নাগরিক কথা বলে যে ভাষায়, সেই বাংলা ভাষা একটি সমৃদ্ধ ভাষা হওয়া সত্ত্বেও তাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেয়া, এর চেয়ে অন্যায় আর কী হতে পারে? হাতের মুঠোয় রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল বলে পাকিস্তানের শাসকেরা বাংলার মতো উন্নত একটি ভাষার বর্ণমালাতেও আঘাত হেনেছে, বাংলা ভাষার হাজার বছরের ঐতিহ্য ও অর্জনকে ধূলিস্যাৎ করার জন্যে নানান চক্রান্ত করেছে, এর চেয়ে অন্যায় আর কী হতে পারে? বাঙালি প্রতিবাদ করেছে এই সব অন্যায়ের। যে কোনো মানুষ তার মাতৃভাষায় কথা বলবে, স্বপ্ন দেখবে, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন চর্চা করবে, ওই ভাষাতেই জীবনযাপন করবে—এ তো তার জন্মগত অধিকার, এই অধিকার কেড়ে নেয়ার চেয়ে অন্যায় আর কী হতে পারে? মাতৃভাষা চর্চার এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালির যে লড়াই যে আত্মত্যাগ, তা এখন সারা দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি স্বীকৃতি পেয়েছে

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের। এই সূত্র ধরেই আমাদের শহীদ মিনার এখন ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়।

ঢাকায় অবস্থিত মূল শহীদ মিনারের আদলের অনুকরণে ছোটখাটো শহীদ মিনার এখন বাংলাদেশের প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কবে কোথায় কীভাবে এগুলো প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়, তার সঠিক ইতিহাস নির্ণয় গভীর গবেষণার বিষয়। তবে সরকারি মদদে অপপ্রচার এবং ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা সত্ত্বেও এ দেশের অনেক জায়গায় সেই পাকিস্তানি আমলেই শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়, এবং প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলা এখন স্বাধীন বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের দিন ফুরিয়েছে অনেক আগেই। তারপরও এই শহীদ মিনারের প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়নি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরও প্রতীক এই শহীদ মিনার। বাঙালি জাতি যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলন করতে গিয়ে শহীদ মিনারের পাদদেশে এসে দাঁড়াবে অনাগত ভবিষ্যতেও।

স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষা

ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই বাঙালি পেয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এই ভাষা আন্দোলনই পূর্ববাংলায় অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। পরবর্তীতে এই চেতনার সাথে যুক্ত হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য ও অন্যায় অবিচারের বোধ। আর এ সবের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন সংগ্রামে এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে এ দেশের আপামর জনসাধারণ যুক্ত হয়ে ভেবেছে এইবার তাদের ভাগ্য বদলে যাবে। সামনে অপার সম্ভাবনা। তারা আন্দোলনে জয়ী হয়েছে, কিন্তু তাদের ভাগ্য কতখানি বদলেছে, বিকশিত হওয়ার অপার সম্ভাবনার কতটুকু তারা কাজে লাগাতে পেরেছে—বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের চার দশক পরেও এ এক জটিল প্রশ্ন বটে। স্বাধীন দেশে মাতৃভাষাই যখন রাষ্ট্রভাষা হয়ে ওঠে, তখন এর সুফলই বা সর্বস্তরের গণমানুষের কাছে কতখানি পৌঁছে যায় সেটাও একটু ভেবে দেখা দরকার। নইলে আর ভাষা আন্দোলনের সার্থকতা নির্ণয় হবে কীভাবে!

ভাষা আন্দোলনের সবচেয়ে বড় সাফল্য—বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন। আর স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধানে ঘোষণা দেয়া হয়—প্রজাতন্ত্রের একমাত্র রাষ্ট্র-ভাষা বাংলা। এটাও আন্দোলনেরই অর্জন। এটা

মোটেই কম কথা নয়। এ অর্জন এ দেশের গণমানুষের দোরগোড়ায় কতটা পৌঁছেছে, তার উপরেই নির্ভর করছে ভাষা আন্দোলনের সার্থকতা।

অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে, খাম-পোস্টকার্ড-মানি অর্ডার ফর্মে, দলিল-দস্তবেজে, রেলগাড়ি স্টিমার লঞ্চের টিকেটে বাংলা ভাষা প্রচলন হয়েছে, এটা সুখের কথা। ব্যাংক-বীমাসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্লাগজপত্রাদি অনেকাংশে বাংলা ভাষার ব্যবহার হওয়ার কারণে স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষের উপকার হয়েছে। শুধুমাত্র ভাষা ব্যবহারে অদক্ষতার কারণে স্বাধীন দেশের কোনো মানুষ যদি নিজেকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক মনে করে, সেটা খুবই দুঃখজনক। স্বাধীনতার চার দশকের মধ্যে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে না পারাটা আমাদের ব্যর্থতারই পরিচয় বহন করে। উচ্চ আদালতে এখনো ইংরেজির প্রতাপই বেশি। আর আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে নানাবিধ হ-য-ব-র-ল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে নানান ছল ছুতো ধরে ইংরেজি মাধ্যম আবারো জাঁকিয়ে বসেছে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কিংবা বিদেশি মডেলের কিন্ডারগার্টেনে ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে না পারলে অনেক অভিভাবকেরই স্বস্তি হয় না। ও-লেভেল এ-লেভেল করে তারা ছোটে বিদেশ পানে। দেশের দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের সকলে এ দেশে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার সুযোগটুকুও সমানভাবে পাবে না। ভাষা আন্দোলনের লক্ষ্য মোটেই এমন ছিল না। উচ্চস্তরে লেখাপড়া এবং বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনো ইংরেজি নির্ভরতা কমানো যায়নি, বাংলাও সেভাবে চালু করা যায়নি। আমাদের ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ—এ তো শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাগ্য পরিবর্তনের উদ্দেশে করা হয়নি। সত্যিকারের কথায় সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রচলনের মধ্য দিয়েই সম্ভব ভাষা আন্দোলন কিংবা মুক্তিযুদ্ধের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশিত পাওনা বুঝিয়ে দেয়া। তাহলেই সার্থক হবে ভাষা আন্দোলন।

সংবিধানে আরো কিছু স্বীকৃতি

ভাষার লড়াই করতে গিয়েই পাকিস্তানি আমলে আমাদের দেখতে হয়েছে বাঙালির প্রাণের কবি রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা নিষিদ্ধ করার এবং সাম্য ও বিদ্রোহের কবি নজরুলের গান-কবিতা অর্জনের পর আমরা দেখি এই দুই কবিকে সাংবিধানিকভাবেই সম্মানিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অমর গান 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' হয়েছে আমাদের জাতীয় সংগীত। আর কাজী নজরুলের 'চল্ চল্ চল্... ' হয়েছে রণসংগীত। হবে না

কেন বলো! তাঁদের গান-কবিতা যে আমাদের জাগরণে আন্দোলনে সংগ্রামে নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়েছে। আমরা তাদের ভুলতে পারি? কবি নজরুলকে দেয়া হয়েছে জাতীয় কবির স্বীকৃতি।

আমরা জাতীয় ফুল ফল, পশুপাখি চিনেছি, জাতীয় ভাষা চিনেছি, জাতীয় অর্জনসমূহ চিনেছি। আমরা এ জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য, গৌরবগাথা জেনেছি। আমরা চিনেছি এ জাতির শ্রেষ্ঠসন্তান জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে। কাজী নজরুলের কবিতার ভাষায় বলতে হয়– 'আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।' না, সহসা বা হঠাৎ চেনা নয়, বাঙালি নিজেকে চিনেছে ভাষা আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়েই।

জাতিসংঘে বাংলা ভাষা

স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। এরপর ২৫ সেপ্টেম্বর প্রথম একজন বাঙালি রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। সারা বিশ্বের বহু জাতির বহু দেশের বহু ভাষার মানুষ কান পেতে শোনে বাংলা ভাষার ধ্বনিমাধুর্য, শব্দ-ঐশ্বর্য, অসামান্য প্রকাশ ক্ষমতা। সেই ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর এটাই হলো বাংলা ভাষার পক্ষে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বজয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরে বাঙালি নেতা শেখ মুজিবের জাতিসংঘ-বক্তৃতার মাধ্যমে বাংলা ভাষা আরো একবার আন্তর্জাতিক সম্মানে অভিষিক্ত হলো।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আন্তর্জাতিকভাবে, অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একযোগে উদযাপিত হয় এমন বেশকিছু আন্তর্জাতিক দিবস আছে। যেমন মে দিবস, নারী দিবস, শিশু দিবস, মা দিবস, বাবা দিবস প্রভৃতি। আমাদের আছে মাতৃভাষা দিবস। একুশে ফেব্রুয়ারি। আমরা বলি শহীদ দিবস। ১৯৫২ সালের এই দিনে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। মাতৃভাষায় কথা বলা, স্বপ্ন দেখা, চিন্তা করা, শিল্পসাহিত্য চর্চা করা, জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন চর্চা করা, পরিপূর্ণ জীবন যাপন করা– এই সবই তো মানুষের জন্মগত অধিকার। যে কোনো জাতির, যে কোনো ভাষা-ভাষী মানুষের এ অধিকার কেউ নাকি কেড়ে নিতে পারে? উত্তরে যে কোনো যুক্তিবাদী মানুষই বলে উঠবে—না, এ হয় না। হওয়া উচিত নয়।

অথচ পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের শাসকেরা তাই করতে চেয়েছিল। সেই রাষ্ট্রের অধিকসংখ্যক নাগরিকের মাতৃভাষা বাংলা। অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত ভাষা। তবু বাংলাকে তারা রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা না দিয়ে বরং ধ্বংস করার জন্য নানাবিধ চক্রান্ত করে। বাঙালিরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানায়, মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যে আন্দোলন করে। বাঙালির এই ন্যায্য দাবি চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যে পাকিস্তান সরকারের পুলিশ-আর্মি ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি (২২ তারিখে ও) গুলি চালিয়ে হত্যা করে প্রতিবাদী ছাত্র যুবককে। মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা তথা আপন মাতৃভাষায় জীবনযাপনের জন্মগত অধিকার রক্ষার জন্যে বাঙালি ছাত্র যুবকের আত্মউৎসর্গের এই ঘটনা পৃথিবীতে একেবারে বিরল ঘটনা। মাতৃভাষার জন্যে জীবন উৎসর্গের এই বিরল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিখে কানাডা প্রবাসী দুই বাঙালি রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম (সৌভাগ্যক্রমে দুই ভাষা শহীদের নামেই তাদের নাম) ১৯৯৮ সালের ৯ জানুয়ারি জাতিসংঘের মহাসচিবকে অবহিত করেন এবং একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার আবেদন জানান। এরপর পদ্ধতিগত বেশকিছু জটিল পথ পাড়ি দিয়ে মহাসচিবের পরামর্শক্রমে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয় ইউনেস্কোর কাছে। অবশেষে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো এই প্রস্তাবে যুক্তির গভীরতা অনুধাবন করে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন এবং জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশগুলোকে এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার আহ্বান জানান। এভাবেই আমাদের একুশ, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে। সেদিন ক্যালেন্ডারের পাতায় ছিল ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯। ১৮৮টি দেশের উপস্থিতিতে এবং সর্বসম্মতিক্রমে ইউনেস্কো গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে তা জানিয়ে দেয়া হয়। ইউনেস্কোর ঘোষণায় বলা হয় : '21 February is proclaimed 'Inter national Mother Language Day' throughout the world to commemorate the martyrs who sacrificed their lives on this day in 1952' অর্থাৎ "১৯৫২ সালের এই দিনে যারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সেই শহীদদের স্মরণে ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' রূপে ঘোষণা করা হলো।"

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট

বাঙালির অমর একুশে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের দায়িত্ব কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। কানাডা প্রবাসী বাঙালি রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালামের গৃহীত উদ্যোগের কথা জানা মাত্রই তিনি সকল প্রকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সে সময়ের শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেককে অতিদ্রুত পাঠিয়ে দেন প্যারিসে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভের পর ২০০১ সালের ১৫ মার্চ জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান বাংলাদেশ ভ্রমণে এলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুরোধে তিনি ঢাকায় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সারা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে থাকা প্রায় ২০০ মিলিয়ন মানুষের মুখের ভাষা বাংলা। বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর অন্যান্য সমৃদ্ধভাষার পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক আলোচনা ও গবেষণার জন্যে এ ধরনের আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দায়িত্ব বাংলাদেশকেই নিতে হয়। ঢাকা শহরের সেগুনবাগিচায় ০১.০৩ একর জমির উপরে সংশোধিত নক্সা অনুযায়ী ৩ তলা এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট ভবনটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পৃথিবীর সব ভাষা সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হবে। হুমকির সম্মুখীন ভাষাগুলোর বিস্তার ঘটনানোর চেষ্টা করা হবে। বিভিন্ন ভাষার উপাদান ডাটাবেজ-এ সংরক্ষণ এবং বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষার উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা

আরবি, ইংরেজি, ফরাসি, চীনা, রুশি ও স্প্যানিস—এই ৬টি ভাষা জাতিসংঘের অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ বা দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা পেছে। ২০০ মিলিয়ন মানুষের মুখের ভাষা বাংলাও তো পেতে পারে এই সম্মান। ২০১০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৪তম অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব রাখেন। এ প্রস্তাব এখনো সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

মোদের গরব মোদের আশা

সেই কবে অতুলপ্রসাদ সেন শুনিয়েছেন—মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা। বাঙালি তখন পরাধীন ছিল। পরাধীন ছিল গোটা ভারতবর্ষ।

তবু সেই পরাধীনতার যুগেও বাঙালি কবি মাতৃভাষা বাংলাকে নিয়ে গর্ব করেছেন, অনেক আশায় বুক বেঁধেছেন। কী সেই আশা? কবি কি একান্তে নিভৃতে কখনো আশা করেছেন—এই বাংলা ভাষা একদিন বাঙালিকে মুক্তির পথ দেখাবে, স্বাধীনতার স্বর্ণদুয়ারে পৌঁছে দেবে? কবি-মনের গভীরে লুকানো সেই আশার কথা আমরা জানি না। তবে এই দেশে বাস্তবে হয়েছে তাই। লড়াই শুরু হয়েছে মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার প্রশ্নে। তারপর ভাষার লড়াই ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে স্বাধিকারের লড়াইয়ে এবং অবশেষে স্বাধীনতার লড়াইয়ে। স্বাধীন দেশে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হয়েছে বাংলা ভাষা। আমাদের গৌরবময় ভাষা আন্দোলনের সবচেয়ে বড় অর্জন– বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ। স্বাধীন দেশে ভাষার মুক্তি এসেছে আপনা আপনি। তবে হ্যাঁ, লড়াইটা ছিল ভাষা নিয়েই। এতসব অর্জনের পরও প্রশ্ন উঠতেই পারে– লড়াইটা কি শেষ হয়েছে, সেই যে ভাষার লড়াই?

রাষ্ট্রীয় সকল কাজকর্ম সম্পাদন করা হয় রাষ্ট্রভাষা দিয়ে। বাংলাদেশে সেটা চলছে বাংলা ভাষাতেই। কাজেই এখন যে কারো মনে হতেই পারে—স্বাধীন দেশে আবার ভাষার লড়াই কিসের? মনে হতে পারে—১৯৫২-তে আমরা যা পেতে চেয়েছিলাম, তারও অধিক পাওয়া হয়ে গেছে আবার কেন লড়াই?

না, এইখানে একটু কথা আছে কিশোর বন্ধুরা। ভাষা আন্দোলন আমাদের অনেক দিয়েছে মানছি। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষা এবং বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার যথেষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়নি। ঘুরে ফিরে সেই ইংরেজি শিক্ষাকেই উৎসাহিত করা হচ্ছে। চারিদিকে ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুল আর কিন্ডারগার্টেনের ছড়াছড়ি। কেউ কেউ আবার আরবি শিক্ষার প্রলোভন দেখিয়ে অভিভাবকের ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের শিক্ষা-বাণিজ্য রমরমা করতে সচেষ্ট। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিসহ আরো একাধিক ভাষা শেখা দোষের কিছু নয়। কিন্তু সবার আগে মাতৃভাষা বাংলা-ই ভালো করে শিখতে হবে, জানতে হবে। মাতৃভাষার নিয়ম-কানুন ব্যাকরণ ভালো করে শিখলে অন্যভাষা শেখাও সহজ হবে। তাছাড়া অন্যভাষার উপরে নির্ভরতা না কমালে বাঙালি নিজের পায়ে দাঁড়াবে কী করে? মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষার জন্যে বাঙালিকে আর কত দিন অপেক্ষা করতে হবে?

ভাষা আন্দোলন তো স্বপ্ন দেখিয়েছে—বাঙালি জীবনের সমস্ত সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে বাংলা ভাষা, প্রতিভা বিকাশের পথে সকল বাধা দূর করে

দেবে বাংলা ভাষা, সর্বোপরি বাংলা ভাষার মধ্য দিয়েই বাঙালির সন্তান পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবে। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি লাভের বয়স চার দশক পেরিয়ে গেছে। তাহলে আজো কেন উচ্চ আদালতে দাঁড়িয়ে বাংলার কৃষককে ইংরেজির কচকচানি শুনতে হবে? বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে এখনো কেন ইংরেজি নির্ভর হয়ে থাকতে হবে? আজো কেন এই দেশে শ্রেণী বৈষম্যের শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু থাকবে?

এসব প্রশ্নের উত্তর আছে। ছোট্ট বন্ধুরা, বড় হতে হতে তোমরা নিশ্চয় সে উত্তর খুঁজে নেবে। আমি শুধু একটুখানি ইঙ্গিত দিয়ে রাখতে চাই। মনে রেখ এই স্বাধীন দেশেও স্বাধীনতার শত্রু আছে, একুশেরও শত্রু আছে। সহজে এদের চেনা মুশকিল, এরা বর্ণচোরা। ইংরেজ আমল বলো, পাকিস্তানি আমল বলো, সব সময় এরা দালালি করেছে ক্ষমতাসীন প্রভুদের। এরা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেয়ে অপরের পায়ে হেলান দিতে পছন্দ করে। পরনির্ভরশীল পরগাছা এরা। আমাদের দুর্ভাগ্য—আমাদের স্বাধীনতার সুফল বা ফসল চলে গেছে এই দালাল শ্রেণীর হাতে। ফলে একুশের স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ বাস্তবায়ন এরা হতে দেবে না—এদের শ্রেণীস্বার্থেই।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এরা বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। এরা শেকড়ের টান অনুভব করে না বললেই চলে। এরা চায় শেকড়কাটা পরগাছা সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতে, গোটা জাতিকে শেকড়হীন করে ফেলতে। এদের জীবন যাপন পদ্ধতি এবং যাপিত জীবনের সংস্কৃতি বাঙালির চিরায়ত জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কহীন। মাতৃভাষা বাংলাতেই শুদ্ধভাবে লিখতে বা কথা বলতে পারে না, অথচ কথায় কথায় বাংলার সঙ্গে অশুদ্ধ ইংরেজি মিশিয়ে এরা নিজেদের আধুনিকতা জাহির করতে চায় এবং শেষ পর্যন্ত পরিবেশ নষ্ট করে। এদের কর্মকাণ্ড বাঙালিত্বের অপমান বই আর কিছু নয়।

প্রিয় সোনামনিরা, বাঙালির ইতিহাসে নিঃসন্দেহে ভাষা আন্দোলন এক উজ্জ্বল অধ্যায়। মনে রাখতে হবে আমাদের এই গৌরবময় আন্দোলনের লক্ষ্য কেবলমাত্র বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই নয়। এমন কি 'সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করার যে শ্লোগান আমরা শুনে এসেছি, সেটাও কিন্তু শেষ কথা নয়। বাঙালির ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত অর্থে আত্মানুসন্ধান এবং আত্মপ্রতিষ্ঠারও আন্দোলন। শতবর্ষ পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভীর আক্ষেপের সঙ্গে লিখেছিলেন—'এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে কীর্তিমন্ত পূর্বপুরুষগণের কীর্তি অবগত নহে। হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী।' এই আপেক্ষ ঘুঁচিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠায় ও কর্মে শহীদ

পূর্বপুরুষদের ঋণ পরিশোধের আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণের মধ্যেই আছে ভাষা আন্দোলনের সার্থকতা। আমাদের ভাষা আন্দোলন আমাদের গৌরবময় অতীতকে স্মরণ করে পরিপূর্ণ বাঙালি হয়ে ওঠারই চিরন্তন আহ্বান জানায়। তোমাদের কাছে প্রত্যাশা—বড় হতে হতে তোমরা সেই পরিপূর্ণ বাঙালি হয়ে ওঠার সাধনায় ব্রতী হবে। একই সঙ্গে সেটাই হবে মানুষ হওয়ার সাধনা। তখন সবাই মিলে মাথা উঁচু করে গাইতে পারব—'মোদের গরম মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা।'

ভাষা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জি

জুলাই ১৯৪৭

উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের পক্ষে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিনের বিবৃতি দান।

২৯ জুলাই ১৯৪৭

ড. জিয়াউদ্দিনের বিবৃতির প্রতিবাদে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর দৈনিক আজদ-এ 'আমাদের ভাষা সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ এবং এ প্রবন্ধে তিনি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জ্ঞানগর্ভ যুক্তি উত্থাপন করেন।

অক্টোবর ১৯৪৭

ফজলুল হক হলের রশিদ বিল্ডিংয়ের একটি কামরায় তমুদ্দুন মজলিশের অফিস কক্ষে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নুরুল হক ভূঞা তার আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।

২৭ নভেম্বর ১৯৪৭

করাচীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে 'উর্দু'কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত।

৫ ডিসেম্বর ১৯৪৭

পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন (১৯৪৭)-এর সিদ্ধান্তের ফলে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সমাজের একটি অংশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭

পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন (১৯৪৭)-এর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ছাত্র বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

৪ জানুয়ারি ১৯৪৮

বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও সমাবেশকে সংগঠিত রূপদানের

লক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮ জানুয়ারি ১৯৪৮

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা ও ছাত্রদের সমস্যা বিষয়ে আলোচনার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে তাঁর বাসভবন 'বর্ধমান হাউসে' সাক্ষাৎ করেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮

পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কুমিল্লার এমএলএ ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুলে সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান, পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন, গণপরিষদের সভাপতি মৌলবী তমিজউদ্দিন খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্য গজনফর আলি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮

গণপরিষদের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ঢাকার ছাত্রসমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে ২৬ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিশ এর যৌথসভায় ১১ মার্চ প্রতিবাদ দিবস হিসেবে ধার্য করা হয়।

২ মার্চ ১৯৪৮

প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়লে ১১ মার্চের ধর্মঘটকে সফল করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত সভায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং জনাব শামসুল আলম এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।

আন্দোলন চলাকালে তমদ্দুন মজলিশের শামসুল আলম এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নঈমুদ্দিন আহমদ যৌথভাবে রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের আহ্বায়কের কাজ করেন। জিন্নাহ ঢাকা ত্যাগ করার পর রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের একটি বৈঠক বসে। এই বৈঠকে শামসুল আলম আহ্বায়কের পদে ইস্তফা দেন।

শামসুল আলমের ইস্তফার পর এম এসসি শেষ বর্ষের ছাত্র আবদুল মান্নান অস্থায়ীভাবে আহ্বায়কের কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনোনীন হন।

১১ মার্চ ১৯৪৮

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঢাকায় প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ এবং সাধারণ ধর্মঘট পালন করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মী ও ছাত্রদের নিয়ে পূর্ব বাংলা সরকারের সচিবালয় ঘেরাও করেন। পিকেটিংরত অবস্থায় পুলিশ বেধড়ক লাঠিচার্জ করে এবং শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক ও অলি আহাদসহ অনেকে গ্রেপ্তার হন।

১৩ মার্চ ১৯৪৮

সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে এই দিন ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

১৪ মার্চ ১৯৪৮

স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের বিস্তার ঘটে এবং সারাদেশে হরতাল পালিত হয়।

১৫ মার্চ ১৯৪৮

পূর্বপাকিস্তান আইন পরিষদের সভা চলাকালে খাজা নাজিমুদ্দিন সরকার রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সদস্যদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং উভয় পক্ষ রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত আট দফা খসড়া চুক্তি প্রণয়ন করেন। খসড়া চুক্তিটি সরকারের পক্ষে খাজা নাজিমুদ্দিন এবং সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কামরুদ্দিন আহমদ স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষরের আগে কারাগারে বন্দী বঙ্গবন্ধুর অনুমোদন নেয়া হয়। চুক্তি মোতাবেক ১৫ মার্চ সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্যরা মুক্তি লাভ করেন।

১৬ মার্চ ১৯৪৮

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের' উদ্যোগে সাধারণ ছাত্র-জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাশেষে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই ধ্বনি দিয়ে একটি বিক্ষোভ মিছিল আইন পরিষদ ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকলে পুলিশ বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর বেধড়ক লাঠিচার্জ এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে।

২১ মার্চ ১৯৪৮

পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) এক জনসভায় ঘোষণা করেন, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' সেখানেই তাঁর এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একদল তরুণ তীব্র প্রতিবাদ জানান।

২৪ মার্চ ১৯৪৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও জিন্নাহ

'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' এই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন। সেখানেও ছাত্রদের মধ্য থেকে এর প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়।

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮

ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানের অভিযোগে মুসলিম লীগ সরকার বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে।

৮ জানুয়ারি ১৯৪৯

পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র ধর্মঘট ও ছাত্রসভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালিত হয়। ১১ মার্চ ১৯৫১ আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়।

১৯৫২

২৭ জানুয়ারি : পল্টন ময়দানের এক বিশাল জনসভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের নির্লজ্জ ঘোষণা : উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।

২৯ জানুয়ারি : বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতিবাদ সভা হয়। নাজিমুদ্দিনের স্বৈরাচারী ঘোষণার প্রতিবাদে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ছাত্ররা সঙ্কল্প গ্রহণ করে।

৩০ জানুয়ারি : ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' পুনরুত্থান করে। এদিন সংগ্রামী ছাত্রছাত্রীরা মিছিল বের করে। মিছিল শেষে ৪ ফেব্রুয়ারি সমগ্র ঢাকা শহরে ছাত্র-ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়।

৩১ জানুয়ারি : বিকেলে ঢাকার বার লাইব্রেরিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

৪ ফেব্রুয়ারি : বেলা ১১টা থেকে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা শোভাযাত্রা সহকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গাজীউল হক। সভা শেষে প্রায় দশ হাজার ছাত্রছাত্রী মিছিল করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে করতে শহর প্রদক্ষিণ করে। বিকেলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে জনসভা হয়। এই সভা বাংলা ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম চালাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই দিন ২১ ফেব্রুয়ারি অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সারা প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান করা হয়।

৬ ফেব্রুয়ারি : মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে ১২ ও ১৩ তারিখ পতাকা দিবস পালনের প্রস্তাব গ্রহণ করে ও জনসাধারণকে সাধ্য অনুযায়ী অর্থসাহায্য দ্বারা আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় সহায়তা করতে আহ্বান জানায়।

১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি : ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে সাফল্যের সঙ্গে পতাকা দিবস পালিত হয়।

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

'রাষ্ট্রভাষা বাংলা' ও 'বন্দী মুক্তির' দাবিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ (বর্তমানে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের সদস্য) কারাগারের অভ্যন্তরে আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিন আহমদকে অনশনরত অবস্থায় কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়।

২০ ফেব্রুয়ারি : ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারার আদেশ জারি করে এক মাসের জন্য ঢাকা শহরে সভা, শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে।

২১ ফেব্রুয়ারি : বেলা বারোটার মধ্যে সব স্কুল-কলেজের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়। সাড়ে বারোটায় গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, দশজন করে ছোট ছোট দল ১৪৪ ধারা ভাঙার জন্য এগিয়ে যাবে।

ছোট ছোট দলে ছাত্ররা বের হয় এবং গ্রেফতার বরণ করে।

ছাত্র জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয়। অপরাহ্নে ছাত্র-জনতার ওপর গুলি বর্ষণ হয়। ঘটনাস্থলে শহীদ হন রফিকউদ্দিন আহমদ। রাত আটটায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শহীদ হন আবুল বরকত। সে রাতে আরো শহীদ হন আবদুল জব্বার।

গুলি বর্ষণের খবরে হাজার হাজার মানুষ মেডিক্যাল কলেজে এসে জমা হতে থাকে।

বিকেল তিনটা থেকে পূর্ববঙ্গ বিধান পরিষদ চলছিল। গুলির খবর শোনার পর মওলানা খোন্দকার আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ বলেন, জনাব স্পিকার সাহেব, প্রশ্নোত্তরের পূর্বে আমি আপনার কাছে একটি নিবেদন করতে চাই। যখন দেশের ছাত্ররা, যারা আমাদের ভাবী আশাভরসাস্থল, পুলিশের গুলির আঘাতে জীবনলীলা সাঙ্গ করেছে, সেই সময় আমরা এখানে

বসে সভা করতে চাই না। প্রথমে Enquiry, তারপর House চলবে।

পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন গুলি চলার সত্যতা স্বীকার করেন, কিন্তু নিহত হওয়ার ঘটনা এড়িয়ে যান।

পরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বসন্তকুমার দাস, মনোরঞ্জন ধর, গোবিন্দ লাল ব্যানার্জী, শামসুদ্দীন আহমদ প্রমুখ তুমুল বিতর্ক উত্থাপন করেন। এই পরিস্থিতিতে মওলানা তর্কবাগীশ বলেন, যখন আমাদের চক্ষের মানিক, আমাদের রাষ্ট্রের ভাবী নেতা ৬ জন ছাত্র রক্তশয্যায় শায়িত, তখন আমরা পাখার নিচে বসে হাওয়া খাব এ আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আমি জালেমের এই জুলুমের প্রতিবাদে পরিষদ গৃহ পরিত্যাগ করছি এবং মানবতার দোহাই দিয়ে আপনার মধ্যস্থতায় সকল মেম্বরের কাছে পরিষদ গৃহ ত্যাগের আবেদন জানাচ্ছি। এই দিন চট্টগ্রামে সেখানকার সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বায়ক মাহবুব-উল-উল আলম চৌধুরী ঢাকায় গুলি চলার খবর পেয়ে 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' নামে একুশের প্রথম কবিতা রচনা করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি : বিক্ষোভে, প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ছাত্র-জনতা। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উপস্থিত কয়েক হাজার মানুষ মাইকে 'গায়েবী জানাজা' পড়ে। এদিন সমস্ত শহর মিলিটারির হাতে দেয়া হয়। তবু অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য মানুষ জানাজায় শরীক হয়।

ইমাম সাহেব মোনাজাতে বলেন, 'হে আল্লাহ্, আমাদের অতি প্রিয় শহীদানের আত্মা যেন চির শান্তি পায়। আর যে জালিমরা আমাদের প্রাণের প্রিয় ছেলেদের খুন করেছে তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায় তোমার দেওয়া এই দুনিয়ার বুক থেকে। এই সব ফেরাউনের খেয়াল-খুশিতে যেন আমাদের সন্তানসন্ততিদের আর জান বলি দিতে না হয়। হে আল্লাহ, তুমি আমাদের মতো শোকসন্তপ্ত উৎপীড়িতদের মোনাজাত কবুল কর।'

'গায়েবী জানাজা'র পর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অলি আহাদ কর্মপন্থা ঘোষণা করে বক্তৃতা করেন। সভার সভাপতি ইমাদুল্লাহ তাঁর ভাষণে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

সভা শেষে লক্ষাধিক জনতার মিছিল বেরোয়। শোভাযাত্রার সম্মুখভাগে নিহত ও আহতদের রক্তমাখা জামাকাপড় দেখানো হয়।

শোভাযাত্রায় লাঠিচার্জ করার পরও জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে না পেরে পুলিশ গুলি চালায়। হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমান নওয়াবপুর রোডে শহীদ হন।

অন্যদিকে সকাল ৯টায় জনসাধারণের এক বিরাট অংশ 'মর্নিং নিউজ' অফিস জ্বালিয়ে দেয়।

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে রেলওয়ে কারখানায় ধর্মঘট ঘোষিত হয়। বেলা ১১টা পর্যন্ত রেল চলাচল বন্ধ থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদে মুসলিম লীগ সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ও তার জন্যে গণপরিষদের কাছে সুপারিশ করার প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন গুলি চালনার প্রতিবাদে বিধান পরিষদের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি : আগের দিনের মতো পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

নাজিরাবাজার পশু হাসপাতালের কাছে জনতার উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ৪ জন আহত হয়।

এ দিনের প্রধান ঘটনা রেল-ধর্মঘট। বেলা ১টা পর্যন্ত ধর্মঘট চলে। ঢাকা রেল-স্টেশনের কর্মচারীরা হরতাল পালন করে। সলিমুল্লাহ হলে গায়েবানা জানাজা হয় বেলা দুটোয়। প্রায় তিন হাজার লোক যোগদান করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর, সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন।

বিকেলে শেরে-বাংলা একে ফজলুল হক মুসলিম হলের সভায় ছাত্রদেরকে শান্তি বজায় রাখতে বলেন। ছাত্রদের দাবিকে জয়যুক্ত করার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি : এদিন ঢাকার অবস্থা কিছুটা শান্ত। শহরে রিকশা আর ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া আর সব যান চলাচল বন্ধ থাকে। ইসলামপুর রোডে এবং রেল স্টেশনে জনতার উপর পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে। গত চারদিন ঢাকা বেতার কেন্দ্রে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। কেবল সংবাদ বুলেটিন ছাড়া অন্য কোনো অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়নি।

এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিল ও অধ্যাপকদের দুটি সভা হয়। উভয় সভায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়।

রাষ্ট্রভাষা সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সভা হয়। কর্মপরিষদ সাময়িকভাবে ধর্মঘট তুলে নেয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি পূরণের জন্য সরকারকে ৫ মার্চ পর্যন্ত সময় দেয়। ৫ মার্চের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে আবার হরতাল চলবে বলে চরমপত্র দেয়া হয়। ৫ মার্চ প্রদেশব্যাপী 'শহীদ দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৯ দফা দাবির ভিত্তিতে সরকারের নিকট নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন দাবি করা হয়।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এক বার্তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদের প্রতি অনশন ভঙ্গের আবেদন জানান।

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

সকাল থেকে সলিমুল্লাহ হল প্রাঙ্গণে ছাত্র ও জনসাধারণ জমায়েত হয়। অনেককে মাইকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য অবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বক্তৃতা করতে দেখা যায়। বেলা ১১টার দিকে পুলিশ ও ইপিআর সলিমুল্লাহ হল থেকে মাইক নিয়ে যায়। অন্যান্য হল থেকেও পুলিশ মাইক ছিনিয়ে নেয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

এদিন মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে নির্মিত শহীদ মিনার পুলিশ ভেঙে দেয়।

ভোরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও ড. বিসি চক্রবর্তী এবং জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক অজিতকুমার গুহকে গ্রেফতার করা হয়। বেলা আড়াইটায় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে খানা-তল্লাশী হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিভ কমিটির সভায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের অবিলম্বে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। ছাত্ররা হল ত্যাগ করে চলে যায়।

২৫ এপ্রিল ১৯৫২

পূর্বপাকিস্তান সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সম্মেলন আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু এই সভায় তাঁর বক্তব্যে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে গণভোট দাবি করেন।

১৯৫৬

পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান করা হয়।

১৯৭৪

১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দান করেন।

১৯৯৯

১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখে ইউনেস্কো আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

[ভাষা আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জি প্রস্তুতের সময় প্রধানত দুটো বই অনুসরণ করা হয়। ১. বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ভাষা আন্দোলনের শহীদেরা এবং ২. বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু।]

সহায়ক পাঠপঞ্জি

১. ড. মোহাম্মদ হাননান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্টুডেন্ট ওয়েজ ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৬২
২. আবুল কাশেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম, পৃষ্ঠা-৩২-৩৮
৩. এবাদত হোসেন মোল্লা : চর্যাপরিচিতি, বাংলা বিভাগ, রা. বি. ১৯৭০, পৃষ্ঠা-১৬৬
৪. আব্দুল মতিন, ভাষা ও একুশের আন্দোলন, নন্দন প্রকাশন, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-৫
৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১
৬. আহমদ রফিক, ছোটদের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, নিউ শিখা প্রকাশনী, ২০১২, পৃষ্ঠা ১০-১১
৭. রফিকুর রশীদ, ভাষার লড়াই ছড়ায় ছড়াই, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১
৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২
৯. ড. মোহাম্মদ হাননান, ভাষার লড়াই : কিশোর ইতিহাস, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১৬
১০. রফিকুর রশীদ, ভাষার লড়াই ছড়ায় ছড়াই, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩
১১. দৈনিক আজাদ, ১৯ মে, ১৯৪৭, সূত্র : হায়াৎ মামুদ, অমর একুশে, বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় প্রকাশ : ৪ ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-৩১
১২. হায়াৎ মামুদ; অমর একুশে, বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় প্রকাশ : ৪ ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-৩৩
১৩. ড. মোহাম্মদ হাননান, ভাষার লড়াই : কিশোর ইতিহাস, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৩৬
১৪. হায়াৎ মামুদ : প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬
১৫. আহমদ রফিক, ছোটদের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, নিউ শিখা প্রকাশনী, ২০১২, পৃষ্ঠা-২০
১৬. জ্যোতির্ময় ঠাকুর, একুশের ইতিহাস, গদ্যপদ্য, ডিসেম্বর ২০১১, পৃষ্ঠা-১৯
১৭. বদরুদ্দীন উমর : পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, পৃষ্ঠা-৪৬

১৮. হায়াৎ মামুদ : গ্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৯
১৯. আহমদ রফিক, গ্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০
২০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১
২১. আব্দুল মতিন, ভাষা ও একুশের আন্দোলন, নন্দন প্রকাশন, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-৭
২২. হায়াৎ মামুদ : প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫০
২৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮
২৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬২-৬৩
২৫. ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১৪
২৬. বশীর আল হেলাল : ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, সূত্র : হায়াৎ মামুদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭১
২৭. ড. মোহাম্মদ হাননান, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৫৪
২৮. বদরুদ্দীন উমর, ভাষা আন্দোলন, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত (বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১, প্রথম খণ্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস (ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ১৯৯৩) পৃষ্ঠা-৪৪১
২৯. অলি আহাদ : জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫ (সাঈদ হাসান প্রকাশিত, ঢাকা) পৃষ্ঠা-৫৯
৩০. ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১৭
৩১. ড. মোহাম্মদ হাননান, ভাষার লড়াই : কিশোর ইতিহাস, আগামী প্রকাশনী ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৪১-৪২
৩২. হায়াৎ মামুদ : প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯২
৩৩. আব্দুল মতিন, ভাষা ও একুশের আন্দোলন, নন্দন প্রকাশন, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-২১
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪-৩৫
৩৬. আহমদ রফিক, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৩৫
৩৭. ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৮১
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০
৩৯. আহমদ রফিক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮

একটি ইত্যাদি প্রকাশনা

ISBN 978 984 904 340 9

সেকায়েপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট

২০১৬ শিক্ষা বছরে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন পরীক্ষায় বিজয়ীদের জন্য মুদ্রিত

অষ্টম শ্রেণির পুরস্কার

বিক্রির জন্য নয়